পশ্চিমবাংলার উদ্ভিদ

বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া

কলিকাতা

পশ্চিমবাংলার উদ্ভিদ

পশ্চিমবাংলার উদ্ভিদ

প্রথম খণ্ড

(র‍্যানানকুলেসি থেকে রেসেডেসি)

শান্তিরঞ্জন ঘোষ

BOTANICAL SURVEY OF INDIA

বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া

কলিকাতা

© Government of India, 1997

Date of Publication : 15th August, 1997

No part of this publication can be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or means by electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of the Director, Botanical Survey of India.

Price : Rs.

Published by the Director, Botanical Survey of India, P-8 Brabourne Road, Calcutta - 700001 and Composed & Printed at M/s. Partha Banerjee, 58, Atindra Mukherjee Lane, Sibpur, Howrah - 711 102, Phone : 246-2911

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
ভূমিকা		১
প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত গোত্র ও গণের পরিচয়		৫
পশ্চিমবাংলা পরিচিতি		২৭
ভৌগলিক অবস্থান ও প্রশাসনিক বিভাগ		২৭
প্রাকৃতিক গঠন		৩০
নদনদী ও জলাভূমি		৪০
ভূতত্ত্ব, মাটি ও ভূ-জল সম্পদ		৪২
জলবায়ু ও আবহাওয়া		৫৩
অরণ্য ও বনানী		৬০
জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য		৮৬
ভূমি সম্পদ, কৃষি ও উপকারী উদ্ভিদ		৮৭
উদ্ভিদগোত্র		
র‍্যানানকুলেসি	(Ranunculaceae)	১০৯
ডিলেনিয়েসি	(Dilleniaceae)	১৬৩
ম্যাগনোলিয়েসি	(Magnoliaceace)	১৬৮
স্কিস্যানড্রেসি	(Schisandraceae)	১৮৩
এ্যানোনেসি	(Annonaceae)	১৮৭
মেনিসপারমেসি	(Menispermaceae)	২০৮
বারবেরিডেসি	(Berberidaceae)	২২২
পোডোফাইলেসি	(Podophyllaceae)	২৩৭
লার্ডিজাব্যালেসি	(Lardizabalaceae)	২৩৮
নেলাম্বোনেসি	(Nelumbonaceae)	২৪০
নিমফিয়েসি	(Nymphaeaceae)	২৩৯, ২৪১
প্যাপাভারেসি	(Papaveraceae)	২৪৬
ফিউমারিয়েসি	(Fumariaceae)	২৫৫
ব্র্যাসিকেসি	(Brassicaceae)	২৬২
ক্যাপারিডেসি	(Capparidaceae)	২৯৪
রেসেডেসি	(Resedaceae)	৩১২

মুখবন্ধ

ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের দ্বিশতবর্ষ উদযাপনের সময় অনুষ্ঠিত 'মানুষ, উদ্ভিদ ও শহর' শীর্ষক সেমিনারের সুপারিশ অনুযায়ী পরিবেশ দূষন রোধে উদ্ভিদের ভূমিকা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় উদ্ভিদ সম্পর্কীয় পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত করা হয়। কারণ মানুষের নিজের স্বার্থও রক্ষা কেবল সরকারী উদ্যোগ বা কিছু উদ্ভিদ বিজ্ঞানী করতে পারে না, এর জন্য চাই ব্যাপক গণ উদ্যোগ। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কয়েক খণ্ডে পশ্চিমবাংলার উদ্ভিদ নামে পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়।

প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হতে চলেছে।

আমার আশা এই বইটি পশ্চিমবাংলার উদ্ভিদগুলি চেনা ও সনাক্তকরণে জনসাধারণকে প্রভূত সাহায্য করবে এবং উদ্ভিদ ও উদ্ভিদের গুণাবলি, উদ্ভিদ বৈচিত্র্য ও সংরক্ষণ সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া
পি-৮, ব্রাবোর্ণ রোড
কলিকাতা - ৭০০ ০০১
১৯৯৭

ডঃ প্রভাত কুমার হাজরা
অধিকর্তা

রকেট লার্কস্পার

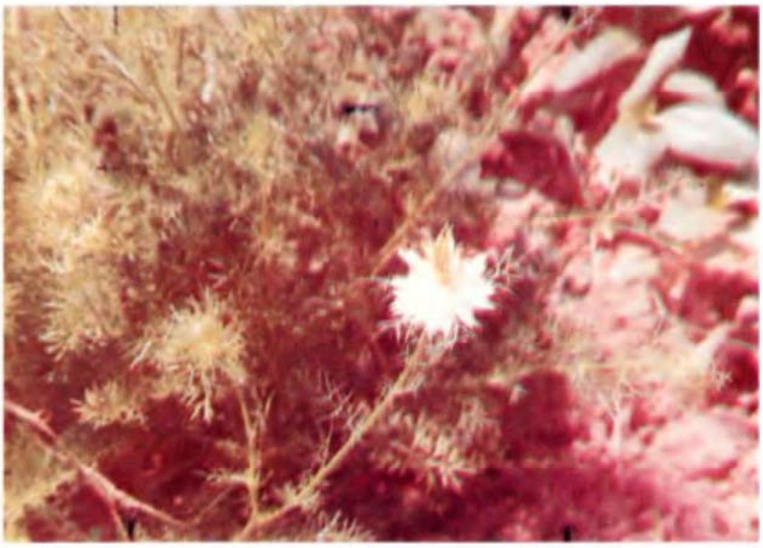

সোহাগ কুহেলী

কনক চালতা

শ্বেত চাঁপা

কাঁঠালী চাঁপা

বড় চালি

দেবদারু

টিলিয়াকোরা

পীত গুলঞ্চ, ঘোড়া গুলঞ্চ

নিমুখা বা পাঠা

পাপড়া বা পাপরা

লাল শালুক বা শাপলা

ক্যালিফোর্নিও পপি

লাল পোস্ত

ক্যাণ্ডি টাফট

পাহাড়ী লাই, পাশাই, পাহাড়ী রাই

লাই, লাহি শাক

বিল রাই

শ্বেত অ্যালিসাম

গোলাপী হুরহুরে

ভূমিকা

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক শ্রী জীবক সম্পর্কে বৌদ্ধ জাতকে কথিত আছে, জীবক তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেষজ বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষান্তে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জীবক সহ তাঁর সমস্ত সহপাঠীকেই নির্দেশ দেন যে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বনভূমির প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট করা অংশ থেকে মানুষের কোন প্রয়োজন আসে না এমন সব লতাগুল্ম, উদ্ভিদ তারা যেন সংগ্রহ করে আনেন। সত্বর জীবক ব্যতীত আর সকলেই বেশ বড় সব উদ্ভিদের বোঝা নিয়ে উপস্থিত হলেন। অধ্যক্ষ জীবককে রিক্ত হস্ত দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, সলজ্জ জীবক নতমস্তকে বলেছিলেন, প্রভু মানব প্রয়োজনে লাগেনা এমন কোন উদ্ভিদ আমি নির্দিষ্ট করতে অক্ষম, তাই আমি রিক্ত হস্ত।

জাতকের এই কাহিনী কতখানি ইতিহাস আর কতটুকু শুধুই গল্প, বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে একটি চিরন্তন ও মহৎ সত্য স্বীকৃতি লাভ করেছে। মানুষসহ প্রাণীজগতের সঙ্গে উদ্ভিদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্ভিদের কল্যাণ স্পর্শে সিঞ্চিত। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, ঔষধ, চলাফেরা এমনকি শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য সমস্ত ক্ষেত্রেই মানুষ উদ্ভিদের উপর একান্ত নির্ভরশীল।

কিন্তু সমস্যা হল মানুষের জীবন প্রায় উদ্ভিদ নির্ভর হয়েও উদ্ভিদ সম্পর্কে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জ্ঞান যেমন স্বল্প, তেমনি বহু ক্ষেত্রে এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ তাদের ঠকাবার কাজটি ভালভাবেই চালিয়ে যায়। যেমন আমরা প্রায় দেখি রাস্তার পাশে বসে একজন কোন এক গাছের শিকড়ের সাহায্যে বেজী অনায়াসে সাপের বিষ ছোবল উপেক্ষা করতে পারে, তাই দেখিয়ে তুখোড় বক্তৃতা করে যাচ্ছে, ফলে গ্রামের নিরীহ মানুষ রাতের বেলায় বিষধর সাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই শিকড় কিনে মিথ্যার শিকার হন।

নানা ধরনের শিকড় বাকড়, গাছের পাতা, ঘাস মাদুলি করে নানা আধি ব্যাধি দূর করা, অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া থেকে সন্তান লাভের আশায় ব্যবহার এমনকি শহরের শিক্ষিতদের মধ্যেও আমরা কম দেখিনা। আবার এর পাশাপাশি বহু উদ্ভিদের গুণাবলি মন্ত্রগুপ্তির মত পারিবারিক সম্পত্তি হিসাবে গোপন রাখার প্রবণতা এই জানাকে অজানায় পরিণত করে। অবশ্য এগুলির জন্য দায়ী আমাদের দেশের নিরক্ষরতা, চরম দারিদ্র্য সেই সঙ্গে অন্ধকুসংস্কার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দেশের অগ্রগতি লক্ষণীয়। খাদ্য উৎপাদনেও আমরা স্বনির্ভর। আধুনিক শিল্প উৎপাদনের জন্য পরিকাঠামোগতভাবেও দেশ প্রায় স্বনির্ভর। কিন্তু দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনে এই অগ্রগতির কোন উল্লেখযোগ্য রেখাপাত ঘটেনি। দেশের

শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ আজও নিরক্ষর। শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ মানুষের জীবনে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অপুষ্টি নিত্য সঙ্গী, তার উপর আছে কুসংস্কার, দৈব শক্তির উপর বিশ্বাস। তিনশো বছর আগে মোঘল ভারতের সামাজিক অবস্থা আলোচনায় বার্নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন "মনে হয় এদেশের লোক জন্মকাল থেকেই জীবনটাকে জ্যোতিষীর কাছে গচ্ছিত রেখেছেন।" আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে স্বাধীনতার এত বছর পরেও অবস্থার একটুও উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয় না। শহরে বা গ্রামে এই সত্য উপলব্ধি করা যায়। এর সঙ্গে আছে জাতীয় যোজনা রূপায়নে আংশিক ব্যর্থতা। যোজনার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাপ্তিসাধ্য সীমিত সঙ্গতির মধ্যে থেকে সর্বাধিক ফললাভের কৌশল উদ্ভাবনের পরিকল্পনা। এই প্রক্রিয়ায় সাফল্য নির্ভর করে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাপক মানুষের সচেতন অংশ গ্রহণের মধ্যেই। এই জন্যেই প্রয়োজন প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান। যেমন ধরা যাক চাষ বৃদ্ধি। অধিক পরিমাণে তরিতরকারী ও ফল উৎপাদন করা, উদ্ভিদের রোগ ও তার প্রতিকার, কোথায় কোন অঞ্চলে কি ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তার অনুসন্ধান, যে সব উদ্ভিদ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে তাদের বীজ সংগ্রহ করে বিজ্ঞান সম্মতভাবে সংরক্ষণ, বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যায় উদ্ভিদের ব্যবহার, পতিত জমির উদ্ধার, নদীর ভাঙন রোধ, খাদ্য ও পুষ্টি, বনৌষধি ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সম্মত ধারণার জন্য আজ ব্যাপক জনশিক্ষার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন পূরণের জন্যই মাতৃভাষার মাধ্যমে আমাদের দেশের মানুষের কাছে তার পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া।

এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যেই ১৯৮৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'মানুষ, উদ্ভিদ ও শহর' শীর্ষক সেমিনারে পরিবেশ, উদ্ভিদ সর্ম্পকে গনচেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তার অন্যতম হল উদ্ভিদ সম্পর্কে গণচেতনা বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান ও বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া নিয়মিতভাবে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করবে। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই পশ্চিমবাংলার উদ্ভিদ সম্পর্কে এই পুস্তক প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সেই পবিকল্পনা আজ বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। এই আশা আমরা অবশ্যই করতে পারি যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এই পুস্তক যেমন ব্যাপক বাংলাভাষী মানুষকে তার পরিবেশ, প্রকৃতি, উদ্ভিদ সর্ম্পকে জানতে সাহায্য করবে তেমনি যারা বা যেসব সংগঠন আজ পরিবেশ রক্ষা, দূষণ রোধের মত কাজে ব্রতী হয়েছেন তাদের কাজেও এই বই অমূল্য সাহায্য যোগাবে বলাই বাহুল্য। পরিবেশ রক্ষার জন্যও গাছ লাগাতে ও বক্ষা করতে বলা হয়েছে। উদ্ভিদগুলিকে চেনার জন্যও এই বই ভয়ানক ভাবে সাহায্য করবে। বইটিব নামকরণ করা হয়েছে 'পশ্চিমবাংলার উদ্ভিদ'।

এই গ্রন্থটির বিভিন্ন খণ্ডে সপুষ্পক উদ্ভিদগুলির ক্ষেত্রে কিছু সংশোধনী সমেত মূলতঃ বেন্থাম ও হুকারের শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করা হয়েছে। প্রতিটি গোত্রের গণ ও প্রজাতিগুলি ইহাদের বৈজ্ঞানিক নামের বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। প্রজাতিগুলির বৈজ্ঞানিক নাম, স্থানীয় নাম, বিবরণ, আঁকা ছবি বা রঙিন অথবা সাদাকালো আলোক চিত্র দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক প্রজাতির কেবল পশ্চিমবাংলায় প্রাপ্তিস্থান, ব্যবহার ও বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। এখানে যেসব ব্যবহারের বা উপকারিতার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি অধিকাংশই অপরিক্ষীত। সাধারণতঃ যেভাবে বিদেশী ভাষায় ফ্লোরা লেখা হয়, সেইভাবে লেখা হয়নি। শুধু সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য প্রজাতিদের পূর্ণ বিবরণ ও ছবি দেওয়া হয়েছে। বাগানে ও চাষের জমিতে চাষযোগ্য প্রজাতিদেরও এখানে চাষ করা হয় এমন সব বিদেশী প্রজাতিগুলির বিবরণও দেওয়া হয়েছে। প্রথম খণ্ডে **র‍্যানানকুলেসি** থেকে **রেসেডেসি** গোত্রের প্রজাতিদের বিবরণ রয়েছে।

এই প্রথম খণ্ডটি প্রণয়নে যারা সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তারা সকলেই বোটানিক্যাল সার্ভের কর্মী। তারা হলেন প্রয়াত শ্রী বারিন ঘোষ, সর্বশ্রী অলোক ভট্টাচার্য্য, মনোজ কুমার মান্না, উমাপদ সমাদ্দার, শীতল অধিকারী, মন্টু বিশ্বাস, উৎপল চ্যাটার্জী, বিপ্রদাস কর, প্রবাল বাসকে, শিবুন মুর্মু, বাসবেন্দ্র ঘোষ, গঙ্গা সিং, জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ, শান্তনু দত্ত, মৃনালকান্তি দেব, সুশীল দত্ত, তপন নন্দী, সমীর চ্যাটার্জী; সুভাষ ঘোষ, নিলিম শ্যাম ও অমিত ঘোষ কিছু উদ্ভিদের আলোকচিত্র তুলে দিয়ে বিশেষ সাহায্য করেছেন।,

প্রুফ সংশোধনে এবং প্রকাশনার কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী রাধাগোবিন্দ ভক্ত, হরমোহন মুখার্জী, সমীরণ রায়, ধ্যানেশ সরদার, অনুপ চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্কর দাস।

সর্বোপরি বোটানিক্যাল সার্ভের প্রাক্তন ডাইরেক্টর ডঃ এম. পি. নায়ার, ডঃ বি. ডি. শর্মা এবং বর্তমান ডাইরেক্টর ডঃ পি. কে. হাজরা এই কাজে উৎসাহ দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, এর জন্য আমরা তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত গোত্র ও গণের পরিচয়

সপুষ্পক উদ্ভিদের গুপ্তবীজী ভাগের দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদগুলির ১৬টি গোত্রের গণ ও প্রজাতিদের সচিত্র বিবরণ এই খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে।

পশ্চিমবাংলায় জন্মায় এমন গোত্র ও গণগুলির পরিচয়

র‍্যানানকুলেসি (Ranunculaceae) : এ্যাকোনাইট বা কাক পা গোত্র

ফরাসী উদ্ভিদবিদ বার্ণাড ডি জুসিউর ভ্রাতুষ্পুত্র, উদ্ভিদের নতুন স্বাভাবিক শ্রেণীবিন্যাসের প্রবক্তা বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী এ্যান্টয়নে লরেন্ট ডি জুসিউ (১৭৪৮-১৮৩৬) এই গোত্রের নামকরণ করেন; র‍্যানান্‌কিউলাস গণের নাম থেকেই এই গোত্রের নামকরণ হয়েছে।

এই গোত্রে সমগ্র পৃথিবীতে ৫০টি গণ ও ১৯০০ প্রজাতি রয়েছে; প্রধানতঃ উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এদের বিস্তার; অধিকাংশ প্রজাতি বীরুৎ, বর্ষজীবী বা মূলাকার কাণ্ড সমেত বহুবর্ষজীবী, কিছু প্রজাতি গুল্ম ও রোহিণী হয়; ভারতে আছে ২৮টি গণ ও ১৯১টি প্রজাতি; পশ্চিমবাংলায় ১৪টি গণ ও ৫৫টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার গণগুলি হলো :

এ্যাকোনাইটাম (Aconitum) : সুইডেনের বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী এবং চিকিৎসক কার্ল ভন লিনিয়াস (১৭০৭-১৭৭৮) এই গণের নামকরণ করেন, তিনিই উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন; তাঁর প্রকাশিত কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'ফিলোসফিয়া বটানিকা', 'জেনেরা প্ল্যানটারাম', 'স্পিসিস প্ল্যানটারাম,' 'সিস্টেমা ন্যাচারা' ইত্যাদি।

গ্রীক 'এ্যাকোনাইটন' শব্দটি 'একন' শব্দ থেকে উদ্ভূত, 'একন' শব্দটির অর্থ তীর, শর বা বাণ; প্রাচীনকালে এ্যাকোনাইটাম উদ্ভিদের মূলের রস তীরের ফলায় ব্যবহৃত হত, 'হিস্টোরিয়া ন্যাচারালিস' গ্রন্থের লেখক রোমের প্রকৃতিবিজ্ঞানী প্লিনির (২৩-৭৯) মতানুসারে কৃষ্ণসাগরের তীরে বিথিনিয়ার হেরাক্লিয়াতে এ্যাকোন নামে একটি বন্দর ছিল, সেখানে এইসব উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত, সম্ভবত এই এ্যাকোন শব্দ থেকে বর্তমান গণটির নাম উদ্ভূত; গ্রীক উপকথানুসারে এ্যাকোনাইটাস পর্বতের নামটি থেকেই এই গণটির নাম উদ্ভূত হয়েছে, সেখানে টাইফন ও একিডনা নামক সর্পাকৃতি স্ত্রীলোকের বংশধর সারবেরাস নামক একটি পাগলা কুকুরের সঙ্গে গ্রীক বীর হারকিউলিসের যুদ্ধ হয়েছিল, বিশ্বাস করা হত সারবেরাসের বিষাক্ত লালা থেকে উদ্ভিদটির জন্ম।

সারা পৃথিবীর উত্তর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এই গণের ৩০০টি প্রজাতি জন্মায়; প্রজাতিদের ফুল নীল, পুষ্পবিন্যাস রেসিম, বৃত্যাংশ একটি বড় হুড তৈরী করে, সব প্রজাতিই বিষাক্ত, এদের কন্দাকৃতি মূল থেকে এ্যাকোনাইটিন গ্রুপের অ্যালকালয়েডগুলি

পাওয়া যায়, যেগুলি ঔষধ প্রস্তুতিতে লাগে; নেপালের এ্যাকোনাইটাম ফেরক্স প্রজাতিটির মূল থেকে ভয়ানক বিষাক্ত বিষ 'বিখ' পাওয়া যায়; ভারতে ২৭টি ও পশ্চিমবাংলার পার্বত্যাঞ্চল দার্জিলিং জেলায় ৫টি প্রজাতি জন্মায়।

এ্যানিমোনে (Anemone) : কার্ল ভন লিনিয়াস এই গণটিরও নামকরণ করেন; তিনি মোট ১৩৩৬টি গণের নামকরণ এবং ১৫ টি গ্রন্থ রচনা করেন।

গ্রীক 'এ্যানিমস' শব্দ থেকে এই নামটি উদ্ভূত, শব্দটির অর্থ বাতাস বা বায়ু, বায়ুতাড়িত অতি উচ্চতায় পার্বত্য অঞ্চলে এই গণের উদ্ভিদগুলি জন্মায় বলে এই নাম; গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে গণটির কিছু উদ্ভিদ দেবতাদের বাসস্থান অলিম্পাস পর্বত থেকে সংগৃহীত হয়েছিল; গ্রীক উপকথায় বাতাসের কন্যার নাম এ্যানিমোনে।

মোট প্রজাতি ১৫০টি, বিস্তার বিশ্বজনীন; প্রজাতিরা সবই মূলাকার কাণ্ড সমেত বীরুৎ এবং পাতা মূলজ; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১৭ ও ৬টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার প্রজাতিরা সকলেই দার্জিলিং পার্বত্যাঞ্চলের।

ক্যালাথোডস (Calathodes) : স্যার উইলিয়াম জ্যাকসন হুকারের পুত্র, খ্যাতনামা উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও অন্বেষী, পরিব্রাজক ও উদ্ভিদ ভৌগলিক, এক সময়ের কিউ গার্ডেনের ডাইরেক্টর, রয়াল সোসাইটির সভাপতি স্যার জোসেফ ডালটন হুকার (১৮১৭-১৯১১) এবং স্যার উইলিয়াম জ্যাকসন হুকারের ছাত্র, ব্রিটিশ চিকিৎসক ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী, বেঙ্গল আর্মির সার্জেন, ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের এক সময়ের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট থমাস থমসন (১৮১৭-১৮৭৮) যুক্তভাবে এই গণের নামকরণ করেন।

গ্রীক শব্দ 'ক্যালাথোস' থেকে গণটির নাম উদ্ভূত; শব্দটির অর্থ কাপ, এই গণের প্রজাতিদের ফুলগুলি কাপের মত বলে এই নাম; মোট তিনটি প্রজাতি, হিমালয়, চীন ও তাইওয়ানে বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি জন্মায়।

ক্যালথা (Caltha) : কার্ল ভন লিনিয়াস এই গণের নামকরণ করেন।

গ্রীক শব্দ 'ক্যালাথোস' এর অর্থ হাতলহীন পান পাত্র বা কাপ, এই গণের উদ্ভিদদের পাপড়িগুলি সোনালী কাপের মত বলে এই নাম; রোমের কবি ভার্জিল (৭০-১৯ খৃঃ পূঃ) ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী প্লিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এই গণের উদ্ভিদগুলির ফুলের রং হলদে।

মোট প্রজাতি ৩২টি; উত্তরমেরু, উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, নিউজিল্যান্ড ও নাতিশীতোষ্ণ দক্ষিণ আমেরিকায় এদের বিস্তার; পাতায় মধু নেই কিন্তু ফল থেকে মধু পাওয়া যায়; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়।

সিমিসিফিউজা (Cimicifuga) : উদ্ভিদবিজ্ঞানী জোহান জ্যাকব ওয়ারনিস্‌চেক্ (১৭৪৩-১৮০৪) এই গণটির নামকরণ করেন।

ল্যাটিন শব্দ 'সিনেক্স' এর অর্থ ছারপোকা এবং 'ফিউগো' শব্দের অর্থ তাড়িয়ে দেওয়া; এই গণের কয়েকটি প্রজাতির পাতায় ছারপোকা ও অন্যান্য পোকামাকড় নাশক কিছু গুণ রয়েছে; ইউরোপের ও ভারতের একটি প্রজাতিকে 'বাগবেন' বলে; পোকামাকড়, মাছি ও মশা, ছারপোকা তাড়াতে এই উদ্ভিদটি ব্যবহৃত হয়; মধ্যযুগে ইউরোপে এই উদ্ভিদটির মূল থেকে তৈরী নির্যাস বাত, বাতশুল রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হত; ফুল থেকে পচা মাছের দুর্গন্ধ বেরোয়, উদ্ভিদটির বৈজ্ঞানিক নাম সিমিসিফিউজা ফোটিডা; উত্তর আমেরিকায় 'কালো সর্পাকৃতি মূল' প্রজাতিটি (সিমিসিফিউজা রেসিমোসা) বমনকারক ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মোট ১৫টি প্রজাতি; উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এদের বিস্তার; ভারত ও পশ্চিমবাংলার পার্বত্যাঞ্চলে একটি প্রজাতি জন্মায়।

ক্লিমেটিস (Clematis) : কার্ল ভন লিনিয়াস এই গণের নামকরণ করেন।

গ্রীক 'ক্লেমা' শব্দের অর্থ আঙ্গুর গাছের শাখা, এই শব্দ থেকেই গণটির নাম; এই গণের অধিকাংশ প্রজাতি আঙ্গুর গাছের মত লতানে আরোহী এবং গুল্ম, এই উদ্ভিদগুলির পাতার বৃন্তের নীচের দিক স্পর্শে খুব সুবেদী; অনেক প্রজাতি শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসাবে বাগানে চাষ হয়; মোট ২৫০টি প্রজাতি; বিস্তার বিশ্বজনীন, মূলতঃ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৩২ ও ১৫টি প্রজাতি জন্মায়।

কনসলিডা (Consolida) : সুইজারল্যান্ডের উদ্ভিদবিজ্ঞানী অগাস্টিন পিরেমাস ডি ক্যাণ্ডোলে (১৭৭৮-১৮৪১) ও চেকোশ্লোভাকিয়ার উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও প্রশাসক ফিলিপ ম্যাক্সিমিলিয়ান অপিজ (১৭৮৭-১৮৫৮) এই গণের নামকরণ করেন।

সারা পৃথিবীতে প্রায় ৩০টি প্রজাতি জন্মায়; উত্তরগোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এদের বিস্তার; ভারতে ৩টি ও পশ্চিমবাংলায় একটি প্রজাতি শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসাবে চাষ হয়; পশ্চিমবাংলার প্রজাতিটির নাম 'রকেট লার্কস্পার'; কনসোলিডা শব্দের অর্থ ঘন, এই গণের প্রজাতিদের পাপড়িগুলি খুব ঘন বলে এই নাম।

ডাইকোকারপাম (Dichocarpum) : চৈনিক উদ্ভিদবিজ্ঞানী ওয়েন তাসাই ওয়াং (১৯২৬) এবং পেই কেন হিসিআও (১৯৬৪) যুগ্মভাবে এই গণের নামকরণ করেন।

মোট প্রজাতি ১৬টি, বিস্তার; হিমালয় ও পূর্ব এশিয়া; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি জন্মায়।

হ্যালারপেস্টেস (Halerpestes) : আমেরিকার উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও ধর্মযাজক এডওয়ার্ড লি গ্রিন (১৮৪৩-১৯১৫) এই গণের নামকরণ করেন।

মোট ৭টি প্রজাতি; বিস্তার উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে; ভারতে এবং পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়।

নারাভেলিয়া (Naravalia) : ফরাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, পরিব্রাজক, বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ও দার্শনিক মাইকেল অ্যাডানসন (১৭২৭-১৮০৬) এই গণের নামকরণ করেন; তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম "ফ্যামিলিয়েস ডেস প্ল্যান্টেস", দুই খণ্ডে প্রকাশিত; নারাভেলিয়া জিলেনিকা প্রজাতিটির সিংহলী নাম 'নারাওয়াএল'; এর থেকেই গণটির নামকরণ হয়েছে; এই উদ্ভিদটির মালয়ালাম নাম 'নারুওয়ালি', এর অর্থ লতানো।

মোট প্রজাতি ৪টি, ক্রান্তীয় অঞ্চলে জন্মায়; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় একটি প্রজাতি জন্মায়।

নাইজেলা (Nigella) : এই গণের নামকরণ করেন কার্ল ভন লিনিয়াস; ল্যাটিন শব্দ 'নাইজার' এর অর্থ কালো বা কৃষ্ণবর্ণ, এই গণের প্রজাতিদের বীজের রং কালো, এর থেকেই গণের নামটির উৎপত্তি; সব প্রজাতি বর্ষজীবী, একটি প্রজাতির ইংরেজী নাম 'ফেনেল ফ্লাওয়ার', বাংলা নাম 'কালো জিরে'; ফারাওয়াদের সময় থেকে বীজ ও বীজের গুড়া রুটিকে সুগন্ধযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মোট ২০টি প্রজাতি; বিস্তার ইউরোপ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে মধ্যএশিয়া; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ২টি প্রজাতির চাষ হয়, কালোজিরে চাষ হয় মশলার জন্য, 'সোহাগকুহেলী' শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসাবে বাগানে চাষ হয়।

অক্সিগ্র্যাফিস (Oxygraphis) : রাশিয়ার উদ্ভিদবিজ্ঞানী, পরিব্রাজক এবং ডরপাট এর প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপক আলেকজান্ডার এ্যান্ডেজেউইস্‌চে ভন বুঙ্গে (১৮০৩-১৮৯০) এই গণের আবিষ্কর্তা।

মোট প্রজাতি ৫টি; বিস্তার এশিয়ার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি জন্মায়।

র‍্যানানকিউলাস (Ranunculus) : এই গণের নামকরণ করেন কার্ল ভন লিনিয়াস; ল্যাটিন শব্দ 'র‍্যানা' র অর্থ একটি ব্যাঙ; উদ্ভিদগুলির প্রাচীন ল্যাটিন নাম র‍্যানা; ব্যাঙ জলাভূমিতে বিচরণ করে, এই গণের কিছু প্রজাতি জলা জায়গায় জন্মায় বলে বোধ হয় এই নাম।

মোট প্রজাতি ৪০০টি; বিস্তার বিশ্বজনীন, নাতিশীতোষ্ণ ও ঠাণ্ডা ক্রান্তীয় পার্বত্য অঞ্চলে জন্মায়; ভারতে এবং পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৩৩ ও ১০টি প্রজাতি জন্মায় প্রায় সবই পার্বত্য অঞ্চলে জন্মায়।

থ্যালিকট্রাম (Thalictrum) : এই গণের নামকরণ করেন কার্ল লিনিয়াস; গ্রীক শব্দ 'থ্যালো' র অর্থ সবুজ হওয়া, এই গণের প্রজাতিদের নূতন কাণ্ড উজ্জ্বল রং এর হয় বলে এর সঙ্গে তুলনা করে এই নাম; 'থ্যালিকট্রন' একটি প্রাচীন গ্রীক নাম।

মোট প্রজাতি ১৫০টি; বিস্তার উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে, ক্রান্তীয় দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায়, ভারতে ও পশ্চিম বাংলায় যথাক্রমে ২১ ও ৮টি প্রজাতি জন্মায়; বিশেষতঃ পার্বত্য অঞ্চলে।

ডিলেনিয়েসি (Dilleniaceae) : চালতা গোত্র

ব্রিটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী, উদ্যানপালক, উদ্ভিদ চিত্রকর রিচার্ড এ্যানথনি স্যালিসবারি (১৭৬১-১৮২৯) এই গোত্রটির নামকরণ করেন; তিনি ১৮০৫-১৮১৬ সাল পর্যন্ত লন্ডনের হর্টিকালচারাল সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলেন; ডিলেনিয়া গণের নাম থেকেই এই গোত্রের নাম।

এই গোত্রে সমগ্র পৃথিবীতে ১০টি গণ ও ৪০০ টি প্রজাতি রয়েছে; ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে এদের বিস্তার; অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলে অনেক প্রজাতি জন্মায়; প্রজাতিগুলি অধিকাংশই ছোটবৃক্ষ, কিছু গুল্ম লতানে প্রজাতিও আছে, কিছু প্রজাতি থেকে তক্তা তৈরী হয় ও রঞ্জক পদার্থ ট্যানিন পাওয়া যায়; ভারতে ৩টি গণ ও ১২টি প্রজাতি এবং পশ্চিমবাংলায় ২টি গণ ও ৫টি প্রজাতি রয়েছে; পশ্চিমবাংলার গণ ২টি হলো :

ডিলেনিয়া (Dillenia) : জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও চিকিৎসক, পরে অক্সফোর্ডের সমসাময়িক অধ্যাপক জোয়ান জ্যাকব ডিলেনিয়াস (১৬৮৪-১৭৪৭) এর সম্মানে কার্ল ভন লিনিয়াস এই গণের নামকরণ করেন।

মোট ৬০টি প্রজাতি; ম্যাসকারানে দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, ইন্দোমালয়, উত্তর কুইন্সল্যান্ড ও ফিজি অঞ্চলে বিস্তৃত; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৭ ও ৪টি প্রজাতি জন্মায়; 'চালতা' প্রজাতিটি খুবই উপকারী; এর স্থায়ী বৃত্যাংশটি মাংসল ও রসালো; বৃত্যাংশটি চাটনী আচার প্রভৃতি করে খাওয়া যায়, আর একটি বিদেশী প্রজাতি পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন বাগানে শোভাবর্ধক প্রজাতি হিসাবে চাষ করা হয়, এর ফুল হলদে; এর বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'কনক চালতা'।

টেট্রাসেরা (Tetracera) : কার্ল ভন লিনিয়াস এই গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক শব্দ 'টেট্রা' ও 'কেরাস' এর অর্থ যথাক্রমে চার ও একটি সিং; এই গণের প্রজাতিদের ফলের ৪টি খণ্ড থাকে এবং এরিল শাখায় বিভক্ত।

মোট ৪০টি প্রজাতি; বিস্তার ক্রান্তীয় অঞ্চল; ভারতে ৪টি প্রজাতি এবং পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি জন্মায়।

ম্যাগনোলিয়েসি (Magnoliaceae) : চাঁপা গোত্র

বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী এ্যানটয়নে লরেন্ট ডি জুসিউ এই গোত্রের নামকরণ করেন; ম্যাগনোলিয়া গণের নাম থেকে এই গোত্রের নাম।

এই গোত্রের মোট ১২টি গণ ও ২৩০টি প্রজাতি রয়েছে; পূর্ব এশিয়া ও আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ, ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে এদের বিস্তার; সবই বৃক্ষ ও গুল্ম প্রজাতি, অনেক প্রজাতির কাঠের তক্তা খুবই উপকারী; ভারতে ৫টি গণ ও ২৫টি প্রজাতি রয়েছে; পশ্চিমবাংলায় ৫টি গণ ও ১৫টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার গণগুলি হলো:

আলসিম্যানড্রা (Alcimandra) : উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও অধ্যাপক জেমস এডগার ড্যান্ডি (১৯০৩-১৯৭৬) এই গণের নামকরণ করেন।

এইগণে মাত্র ১টি প্রজাতি রয়েছে; প্রাপ্তিস্থান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় একটি প্রজাতি জন্মায়।

লিরিওডেনড্রন (Liriodendron) : কার্ল ভন লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন;

গ্রীক শব্দ 'লেইরিওন' ও 'ডেনড্রন' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে একটি লিলি ও একটি বৃক্ষ; এই গণের প্রজাতির ফুল লিলি ফুলের মত বলে গণটির এই নাম।

এই গণে মাত্র ১টি প্রজাতি; উত্তর পূর্ব আমেরিকা, চীন, উত্তর ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে জন্মায়; ভারত ও পশ্চিমবাংলার পাহাড়ী বাগানে গাছটি বসানো হয়; ইংরেজী নাম 'টিউলিপ ট্রি', বাংলা নাম টিউলিপ চাঁপা; এর তক্তা খুবই উপকারী।

ম্যাগনোলিয়া (Magnolia) : ফ্রান্সের মঁপেলিয়ার উদ্ভিদ উদ্যানের অধিকর্তা ও চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যাপক পিয়েরে ম্যাগনল (১৬৩৮-১৭১৫) এর সম্মানার্থে এবং নামানুসারে কার্ল ভন লিনিয়াস এই গনের নামকরণ করেন।

মোট ৮০টি প্রজাতি হিমালয় থেকে জাপান, বোর্ণিও, জাভা, পূর্ব ও উত্তর আমেরিকা, ভেনেজুয়েলা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এদের বিস্তার, সকলেই বৃক্ষ অথবা গুল্ম, ভারতে ১১টি ও পশ্চিমবাংলায় ৫টি প্রজাতি জন্মায় বা চাষ হয়; এই গণের কয়েকটি প্রজাতি সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত ফুলের জন্য বাগানে চাষ হয়; এই গণের প্রজাতিদের ফুল সব সময় শাখার শীর্ষে হয়।

মাইকেলিয়া (Michelia) : ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী পিয়েট্রো এন্টোনিও মাইকেলী (১৬৭৯-১৭৩৭) এর স্মরণে ও নামানুসারে কার্ল ভন লিনিয়াস এই গণের নামকরণ করেন; বিজ্ঞানী মাইকেলী অপুষ্পক উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণায় বিখ্যাত; স্বর্ণচাঁপার সংস্কৃত নাম চম্পকা; দক্ষিণপূর্ব এশিয়া হিন্দু সংস্কৃতি প্রসারিত হওয়ার সময় এই নামটিও প্রচারিত হয়েছিল; বর্তমান কামপুচিয়া বা ক্যাম্বোডিয়ার প্রাচীন নাম চম্পা।

মোট প্রজাতি ৫০টি, বিস্তার ক্রান্তীয় এশিয়া ও চীন; এই গণের প্রজাতিদের ফুল সর্বদা কাক্ষিক; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১২ ও ৭টি প্রজাতি জন্মায়, স্বর্ণচাঁপা প্রজাতিটি সুগন্ধযুক্ত ফুলের জন্য বিখ্যাত।

টালাউমা (Talauma) : উদ্ভিদবিজ্ঞানী এ্যান্টয়নে লরেন্ট ডি জুসিউ এই গণের নামকরণ করেন। টালাউমা নামটি হচ্ছে পশ্চিমভারতীয় স্থানীয় নাম।

মোট প্রজাতি ৫০টি; বিস্তার পূর্ব হিমালয়, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো থেকে ক্রান্তীয় দক্ষিণ আমেরিকা, ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৫টি ও ১টি প্রজাতি জন্মায়।

স্কিস্যানড্রেসি (Schisandraceae) : রোহিণী চাঁপা গোত্র

ওলন্দাজ বা হল্যাণ্ডের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী কার্ল লুডউইগ ব্লুম (১৭৯৬-১৮৬২) এই গোত্রের নামকরণ করেন; তিনি জাভায় যান এবং উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করেন; তিনি দীর্ঘদিন লাইডেনের রিখ হারবেরিয়ামের ডাইরেক্টর ছিলেন; স্কিস্যান্ড্রা গণের নাম থেকেই এই গোত্রের নাম।

এই গোত্রে ২টি গণ ও ৪৭টি প্রজাতি বর্তমান; এদের বিস্তার পূর্বএশিয়া, পশ্চিম মালয়েশিয়া, দক্ষিণপূর্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; সব প্রজাতিই আরোহী বা রোহিণী গুল্ম, পাতা সরল ও উপপত্রহীন, ভারতে ২টি গণের ৬টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলায় ২টি গণের ৪টি প্রজাতি জন্মায়।

কদসুরা (Kadsura) : উদ্ভিদবিজ্ঞানী এ্যানটয়নে লরেন্ট ডি জুসিউ এই গণের নামকরণ করেন; জাপানি নাম কদসুরা থেকেই এই গণের নাম হয়েছে।

মোট ২২ টি প্রজাতি; এদের বিস্তার ভারত, চীন, জাপান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম মালয়েশিয়া ও মলাক্কাস অঞ্চলে; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় একটি প্রজাতি জন্মায়।

স্কিস্যান্ড্রা (Schisandra) : ফরাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী এ্যানড্রে মিচাউক্স (১৭৪৬-১৮০৩) এই গণটির নামকরণ করেন, তিনি ইরাণ, উত্তর আমেরিকা, মাদাগাস্কার পরিভ্রমণ করেন; গ্রীক শব্দ 'স্কিজো' ও 'এ্যানার' এর অর্থ যথাক্রমে লম্বালম্বি চেরা ও পুং প্রজাতিদের পরাগধানী চেরা বলে এই নাম।

মোট প্রজাতি ২৫টি; বিস্তার এশিয়া, পূর্ব, উত্তর আমেরিকার ক্রান্তীয় ও উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে; ভারতে ৫টি ও পশ্চিমবাংলায় ৩টি প্রজাতি জন্মায়।

এ্যানোনেসি (Annonaceae) : আতা গোত্র

ফরাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী এ্যানটয়নে লরেন্ট ডি জুসিউ (১৭৪৮-১৮৩৬) এই গোত্রের নামকরণ করেন; এ্যানোনা গণের নাম থেকেই গোত্রটির নাম।

এই গোত্রের মোট ১২০টি গণ ও ২১০০ প্রজাতি রয়েছে; একটি ছাড়া সব প্রজাতিই বৃক্ষ বা গুল্ম জাতীয়, এদের বিস্তার মূলতঃ ক্রান্তীয় অঞ্চলে (বিশেষ করে

পুরানো পৃথিবীতে); ভারতে ২৪টি গণ ও ১২০ টি প্রজাতি এবং পশ্চিমবাংলায় ১০টি গণ ও ২২টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার গণগুলি হলো

অলফনসিয়া (Alphonsia) : সুইজারল্যান্ড উদ্ভিদবিজ্ঞানী এবং আগাস্টিন পিরেমাস ডি ক্যাণ্ডোলের (১৭৭৮-১৮৪১) পুত্র আলফন্সে লুইস পিয়েরে পিরেমাস ডি ক্যাণ্ডোলের (১৮০৬-১৮৯৩) সম্মানে ও নামানুসারে উইলিয়াম জ্যাকসন হুকারের পুত্র ব্রিটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী জোসেফ ডালটন হুকার (১৮১৭-১৯১১) এবং ব্রিটিশ চিকিৎসক ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী থমাস থমসন (১৮১৭-১৮৭৮) যুক্তভাবে এই গণটির নামকরণ করেন।

মোট প্রজাতি ৩০টি; বিস্তার চীন, ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া; ভারতে ৫টি ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি জন্মায়।

এ্যানোনা (Anonna) : কার্ল ভন লিনিয়াস এই গণের নামকরণ করেন; এই নামটি একটি ব্রাজিলিও নাম।

মোট প্রজাতি ১২০টি; বিস্তার মূলতঃ উষ্ণমণ্ডলীয় আমেরিকা; প্রজাতিদের ফল বেরী বা গর্ভকেশরগুলি যুক্ত হয়ে যৌগিক ফল সৃষ্টি করে; ভারতে ও পশ্চিমাবাংলায় যথাক্রমে ৫ ও ২টি প্রজাতি বাগানে চাষ করা হয়; সবকটি প্রজাতিই বিদেশী, পশ্চিমবাংলায় প্রজাতি দুটির বাংলা নাম আতা ও নোনা।

আর্টাবট্রিস (Artabotrys) : ব্রিটিশ চিকিৎসক ও খ্যাতনামা উদ্ভিদবিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন (১৭৭৩-১৮৫৮) এই গণের নামকরণ করেন; তিনি স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং লিনিয়ান সোসাইটির গ্রন্থাগারিক ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রথম রক্ষক ছিলেন; তিনি চিকিৎসক ও প্রকৃতিবিদ হিসাবে অস্ট্রেলিয়ায় যান।

গ্রীক 'আর্টাও' ও 'বট্রিস' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে ঝুলন্ত ও আঙ্গুর গুচ্ছ; এই গণের প্রজাতিদের পুষ্পবৃন্ত বাঁকানো হুকের মত বলে এই নাম।

মোট প্রজাতি প্রায় ১০০ টি; বিস্তার ক্রান্তীয় আফ্রিকা, ভারত সহ দক্ষিণ পূর্বএশিয়া; কয়েকটি প্রজাতির ফল খায়; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৬টি ও ১টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার প্রজাতিটির বাংলা নাম কাঁঠালী চাঁপা।

কানাঙ্গা (Cananga) : প্রথমে সুইজ উদ্ভিদবিজ্ঞানী আগাষ্টিন পিরেমাস ডিক্যাণ্ডোলে (১৭৭৮-১৮৪১) এবং পরে স্যার জোসেফ ডালটন হুকার (১৮১৭-১৯১১) এবং উইলিয়াম জ্যাকসন হুকারের ছাত্র ব্রিটিশ চিকিৎসক ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী, বেঙ্গল আর্মির সার্জেন ও ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের সুপারিনটেনডেন্ট থমাস থমসন (১৮১৭-১৮৭৮) যুক্তভাবে এই গণটির নামকরণ করেন।

মোট ২টি প্রজাতি; প্রাপ্তিস্থান উষ্ণমণ্ডলীয় এশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া; দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি প্রজাতি ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় সুগন্ধি ফুলের জন্য বাগানে বসানো হয়; এর ফুল থেকে ইলাং ইলাং অথবা ম্যাকাসার তেল নামে সুগন্ধি প্রস্তুত হয়।

ডেসমস (Desmos) : পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারক ও প্রকৃতিবিদ্ জোযাওদে লওরিরো (১৭১৭-১৭৯১) এই গণের নামকরণ করেন; তার বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম 'ফ্লোরা কোচিনচাইনেনসিস'; গ্রীক শব্দ 'ডেসমস' এর অর্থ বন্ধনী, এখানে এর অর্থ গর্ভপত্রগুলি সাধারণ পুষ্পবৃন্তের সঙ্গে সংযুক্ত।

মোট ৩০টি প্রজাতি; ভারতীয় উপমহাদেশ, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এই গণের প্রজাতিদের বিস্তার; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৮টি ও ৩টি প্রজাতি জন্মায়।

ফিসিস্টিগ্মা (Fissistigma) : ইংরেজ চিকিৎসক ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী উইলিয়াম গ্রিফিথ (১৮১০-১৮৪৫) এই গণের নামকরণ করেন; ল্যাটিন 'ফিসি' ও 'স্টিগ্মা' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে চেরা ও গর্ভমুণ্ড; এই গণের প্রজাতিদের ফুলের গর্ভমুণ্ড চেরা বলে এই নাম।

মোট ৬০টি প্রজাতি; এদের বিস্তার উষ্ণমণ্ডলীয় আফ্রিকা, দক্ষিণ পশ্চিম চীন, ভারতীয় উপমহাদেশ, মালয়, উত্তর পূর্ব অস্ট্রেলিয়া; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৮টি ও ১টি প্রজাতি জন্মায়।

গোনিওথ্যালামাস (Goniothalamus) : স্যার উইলিয়াম জ্যাকসন হুকারের পুত্র খ্যাতনামা ইংরেজ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও অন্বেষী, পরিব্রাজক ও উদ্ভিদ ভৌগলিক, কিউ গার্ডেনের ডাইরেক্টর, রয়াল সোসাইটির সভাপতি স্যার জোসেফ ডালটন হুকার (১৮১৭-১৯১১) এবং প্রথম হুকারের ছাত্র, ইংরেজ চিকিৎসক ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী, বেঙ্গল আর্মির সার্জেন ও ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের সুপারিনটেনডেন্ট থমাস থমসন (১৮১৭-১৮৭৮) যুক্তভাবে এই গণের নামকরণ করেন।

মোট প্রজাতি ১১৫টি; প্রাপ্তিস্থান ভারত সহ পূর্ব এশিয়া; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১০টি ও ২টি প্রজাতি জন্মায়।

মিলিউসা (Miliusa) : ফরাসী উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও পরিব্রাজক জিন ব্যাপটিস্ট লুইস থিওডোরে লেসচেনল্ট (১৭৭৩-১৮২৬) এবং আগাস্টিন পিরেমাস ডি ক্যাণ্ডোলে (১৭৭৮-১৮৪১) যুক্তভাবে এই গণের নামকরণ করেন।

মোট প্রজাতি ৪০টি; প্রাপ্তিস্থান ভারতীয় উপমহাদেশ, মালয়েশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১৪টি ও ৫টি প্রজাতি জন্মায়।

পলিয়ালথিয়া (Polyalthia) : জার্মানীতে জন্ম ওলন্দাজ উদ্ভিদবিজ্ঞানী কার্ল লুডউইগ ব্লুম (১৭৯৬-১৮৬২) এই গণের নামকরণ করেন।

মোট প্রজাতি ১২০টি; এদের বিস্তার ভারতীয় উপমহাদেশ, মালয়েশিয়া, উষ্ণমণ্ডলীয় আফ্রিকা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও মাদাগাস্কার; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে

১৪টি ও ৪টি প্রজাতি জন্মায়; দেবদারু প্রজাতিটি রাস্তার ধারে সৌন্দর্যবর্ধক উদ্ভিদ হিসাবে লাগানো হয়।

উভারিয়া (Uvaria) : কার্ল ভন লিনিয়াস এই গণের নামকরণ করেন। ল্যাটিন শব্দ 'উভা'র অর্থ এক গুচ্ছ আঙ্গুর; গণটির প্রজাতিদের ফল এক গুচ্ছ আঙ্গুরের মত দেখায় বলে এই নামকরণ।

মোট প্রজাতি ১৫০টি; বিস্তার উষ্ণমণ্ডলীয় আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, ভারত সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া; অধিকাংশ প্রজাতি আরোহী বা রোহিণী, পুষ্পবৃন্তে বাঁকানো হুক থাকে; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১০ ও ২টি প্রজাতি জন্মায়।

মেনিসপারমেসি (Menispermaceae) : আকানদি, টিলিয়াকোরা, নিমুখা বা গুলঞ্চ গোত্র

এ্যানটয়নে লরেন্ট ডি জুসিউ (১৭৪৮-১৮৩৬) এই গোত্রের নামকরণ করেন; এই মেনিসপারমাম গণটির নাম থেকেই এই গোত্রের নামকরণ; এই গণের কোন প্রজাতি আমাদের দেশে জন্মায় না; এই গণের প্রজাতিদের মুনসিড বলে; এর থেকে সাধারণভাবে এই গোত্রটিকে মুনসিড গোত্রও বলে।

এই গোত্রে মোট ৬৫টি গণ ও ৩৫০টি প্রজাতি রয়েছে; অধিকাংশ প্রজাতি আরোহী গুল্ম, বীরুৎ অথবা বৃক্ষ প্রজাতিও রয়েছে; ভারতে ২০টি গণের ৪৩টি প্রজাতি এবং পশ্চিমবাংলায় ১০টি গণের ১৪টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার গণগুলি হলোঃ

এ্যাসপিডোকেরিয়া (Aspidocarya) : স্যার জোসেফ ডালটন হুকার ও থমাস থমসন যুক্তভাবে এই গণের নামকরণ করেন; গ্রীক 'এ্যাসপিস' ও 'ক্যারিওন' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে শিল্ড ও নাট; ইহা এই উদ্ভিদের বীজের আকারের সঙ্গে তুলনীয়।

১টি মাত্র প্রজাতি; পূর্ব হিমালয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় জন্মায়; পশ্চিমবাংলার দার্জিলিং পার্ব্বত্যাঞ্চলে এটি জন্মায়।

সিসামপেলোস (Cissampelos) : কার্ল লিনিয়াস এই গণের নামকরণ করেন; গ্রীক 'কিসোস' ও 'এ্যাম্পেলোস' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে আইভি ও লতানে; এই গণের উদ্ভিদগুলির বৈশিষ্ট্য এইরূপ হওয়ার জন্য এই নাম।

মোট প্রজাতি ৩০টি; উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে জন্মায়; 'আকানদি' প্রজাতির মূল ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি জন্মায়।

ককিউলাস (Cocculus) : সুইজারল্যান্ডের উদ্ভিদবিজ্ঞানী আগাস্টিন পিরেমাস ডি ক্যাণ্ডোলে (১৭৭৮-১৮৪১) এই গণের নামকরণ করেন; দক্ষিণ আমেরিকা ব্যতীত পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে জন্মায়।

মোট প্রজাতি ১১টি, ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৫টি ও ১টি জন্মায়।

সাইক্লিয়া (Cyclea) : গ্রীক 'কিকলোস' শব্দের অর্থ গোলাকার, এই গণের প্রজাতিদের বীজ গোলাকার বলে এই নাম; স্কটল্যাণ্ডের উদ্ভিদবিজ্ঞানী জর্জ আরনট ওয়াকার; আরনট (১৭৯৯-১৮৬৮) এবং ইংরেজ চিকিৎসক ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রবার্ট হোয়াইট (১৭৯৬-১৮৭২) যুক্তভাবে এই গণের নামকরণ করেন।

মোট প্রজাতি ৩০টি; সাধারণতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এশিয়ায় জন্মায়; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৮টি ও ১টি জন্মায়।

প্যারাবেনা (Parabaena) : ব্রিটিশ ধাতুবিদ ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী জন মিয়ার্স (১৭৮৯-১৮৭৯) এই গণের নামকরণ করেন; তিনি দক্ষিণ আমেরিকা পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং লণ্ডনে বেসরকারী বৈজ্ঞানিক হিসাবে কাজ করতেন; তিনিই প্রথম মেনিসপারমেসি গোত্রের উপর গবেষণা করেন এবং একটি মোনোগ্রাফ প্রকাশ করেন; গ্রীক 'প্যারা' এবং 'বায়েন' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে ছাড়া ও চলা, এই গণের প্রজাতিদের রোহিনী বৈশিষ্ট্যের জন্য এই নাম; আসল অর্থ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া।

মোট প্রজাতি ১৫টি; ভারত সহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এদের প্রাপ্তিস্থান; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৬টি ও ১টি জন্মায়।

পেরিক্যাম্পাইলাস (Pericampylus) : জন মিয়ার্স এই গণের নামকরণ করেন; গ্রীক 'পেরি' ও 'ক্যাম্পুলাস' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে গোল ও পাকানো; এই গণের প্রজাতিদের বীজ পাকানো বলে এই নাম।

মোট প্রজাতি ৭টি; বিস্তার পূর্ব হিমালয়, পশ্চিম চীন থেকে পশ্চিম মালয়েশিয়া ও মলাক্কাস পর্য্যন্ত; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২টি ও ১টি প্রজাতি জন্মায়।

পিকনারহেনা (Pycnarrhena) : মেনিসপারমেসি গোত্রের প্রজাতিদের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জন মিয়ার্স গণটির নামকরণ করেন; গ্রীক 'পিকনোস' ও 'আরহেনাস' শব্দদ্বয়ের অর্থ ঘন ও পুরুষ; পুরুষ পুষ্পমঞ্জরীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

মোট প্রজাতি ২৫টি; দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, ইন্দোমালয়েশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় জন্মায়; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২টি ও ১টি জন্মায়।

স্টেফানিয়া (Stephania) : মস্কোর উদ্ভিদবিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রেডারিক স্টেফান এর সম্মানার্থে ও নামানুসারে পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারক ও প্রকৃতিবিদ জোয়াও দে লওরিরো (১৭১৭-১৭৯১) এই গণের নামকরণ করেন।

মোট প্রজাতি ৩৫টি, আফ্রিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে জন্মায়; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৮টি ও ৩টি প্রজাতি জন্মায়; উল্লেখযোগ্যটি হলো ভেষজ উদ্ভিদ নিমুখা।

টিলিয়াকোরা (Tiliacora) : ভারতে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট্, সংস্কৃত সাহিত্যে ও ভাষায় পণ্ডিত এবং অপেশাদার উদ্ভিদবিজ্ঞানী হেনরি থমাস কোলেব্রুক (১৭৬৫-১৮৩৭) এই গণের নামকরণ করেন; বাংলা নাম টিলিয়াকোরা বা তিলিয়াকোরা থেকে এই গণের নামকরণ।

মোট ১৯টি প্রজাতি; আফ্রিকা, ভারত সহ ইন্দোমালয়ের উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে জন্মায়; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২টি ও ১টি জন্মায়; পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিটির বাংলা নাম টিলিয়াকোরা।

টিনোসপোরা (Tinospora) : জন মিয়ার্স এই গণের নামকরণ করেন।

মোট প্রজাতি ৩২টি; আফ্রিকা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, ইন্দোমালয়, অস্ট্রেলিয়ার ক্রান্তীয় অঞ্চলে জন্মায়; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৪টি ও ৩টি জন্মায়।

বারবেরিডেসি* (Berberidaceae) : *বারবেরি গোত্র

ফরাসী উদ্ভিদবিজ্ঞানী এ্যান্টয়নে লয়েন্ট ডি জুসিউ (১৭৪৮ ১৮৩৬) এই গোত্রের নামকরণ করেন; বারবেরিস গণের নাম থেকেই এই গোত্রের নাম।

৪টি গণ ও ৫৭৫টি প্রজাতি বর্তমান; উত্তর নাতিশীতোষ্ণ ও ক্রান্তীয় পার্বত্য অঞ্চল ও দক্ষিণ আমেরিকায় এদের বিস্তার; সকলেই বহুবর্ষজীবী গুল্ম; ভারতে ৩টি গণ ও ৬৮টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলায় ৩টি গণ ও ১৫টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার গণগুলি হলো

বারবেরিস (Berberis) : আরবীও নাম 'বারবেরিস' থেকে কার্ল লিনিয়াস এই গণের নামকরণ করেন; সাধারণভাবে এই গণের উদ্ভিদদের নাম বারবেরি; ভারতীয় বারবেরি *(বারবেরিস এরিস্টাটা)* ভেষজ উদ্ভিদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মোট প্রজাতি ৪৫০টি; উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া, উত্তর আফ্রিকায় এরা জন্মায়; সব প্রজাতিই গুল্ম, অনেকগুলি প্রজাতি শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসাবে বাগানে চাষ হয়; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৫৪টি ও ১২টি প্রজাতি জন্মায়।

ম্যাহনিয়া (Mahonia) : আমেরিকার উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও 'দি আমেরিক্যান গার্ডেনার্স ক্যালেণ্ডার' (১৮০৭) নামক বইটির লেখক বার্ণাড এম মাহন (১৭৭৫-১৮১৬) এর সম্মানার্থে ও নামানুসারে ইংরেজ প্রকৃতিবিদ থমাস নাটাল (১৭৮৬-১৮৫৯) এই গণের নামকরণ করেন।

মোট ৭০টি প্রজাতি; হিমালয় থেকে জাপান, সুমাত্রা, উত্তর ও মধ্য আমেরিকায় এদের বিস্তার; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১৩টি ও ২টি প্রজাতি জন্মায়।

নন্ডিনা (Nandina) : সুইডেনের উদ্ভিদবিজ্ঞানী, কার্ল ভন লিনিয়াসের বন্ধু কার্ল পিটার থানবার্জ (১৭৪৩-১৮২৮) এই গণের নামকরণ করেন; জাপানি নাম নন্দিন থেকে গণটির নামকরণ।

মোট ১টি প্রজাতি; জাপান ও চীনে জন্মায়; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় মূলতঃ পাহাড়ী উদ্ভিদ উদ্যানে শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসাবে প্রজাতিটি চাষ করা হয়।

পোডোফাইলেসি (Podophyllaceae) : পাপরা গোত্র

সুইজারল্যান্ডের উদ্ভিদবিজ্ঞানী আগাস্টিন পিরেমাস ডি ক্যাণ্ডোলে (১৭৭৮-১৮৪১) এই গোত্রটির নামকরণ করেন; পোডোফাইলাম গণের নাম থেকে গোত্র নামটি হয়েছে।

মোট ৬টি গণ ও ২০ প্রজাতি; এদের বিস্তার উত্তর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে, মূলতঃ পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব ও উত্তর আমেরিকায়; উদ্ভিদগুলি বর্ষজীবী বীরুৎ; ভারতে ১টি গণ ও দুটি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার পার্বত্য অঞ্চলে ১টি গণ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়।

পোডোফাইলাম (Podophyllum) : কার্ল ভন লিনিয়াস এই গণের নামকরণ করেন; 'পোডোস' ও 'ফাইলন' এই দুটি গ্রীক শব্দের অর্থ যথাক্রমে এক ফুট ও পাতা, এই গণের প্রজাতিদের পাতার আকার বোঝানো হয়েছে এই শব্দ দুটির দ্বারা, প্রজাতিদের মূল ও পাতা বিষাক্ত; এই সব প্রজাতিদের ফল মে মাসে পাকে বলে এই উদ্ভিদদের 'মে আপেল' বলে।

মোট ১১টি প্রজাতি; বিস্তার হিমালয় থেকে পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব উত্তর আমেরিকা; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২টি ও ১টি প্রজাতি পার্বত্য অঞ্চলে জন্মায়; পশ্চিমবাংলার প্রজাতিটির বাংলা নাম 'পাপরা'।

লার্ডিজাব্যালেসি (Lardizabalaceae) : গোফল বা বাগুল গোত্র

প্যারিসের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত বেলজিয়ামের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জোসেফ ডেকাইসনে (১৮০৭-১৮৮২) এই গোত্রটির নামকরণ করেন; কেবল চিলি দেশে প্রাপ্ত লার্ডিজাবালা গণ থেকেই এই গোত্রের নাম।

মোট ৮টি গণ ও ৩০টি প্রজাতি; এই গোত্রের প্রজাতিদের বিস্তার হিমালয় থেকে জাপান ও দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশে; অধিকাংশ প্রজাতি আরোহী গুল্ম ও পাতা করতলাকৃতি; একটি প্রজাতি বৃক্ষ ও এর পাতা পক্ষল যৌগিক; ভারতে ৩টি গণ ও

৫টি প্রজাতি এবং পশ্চিমবাংলায় ১টি গণ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার গণটি হলো

হলবোয়েলিয়া (Holboellia) : নিউজিল্যান্ডের ফ্রাইডেনবাগে জন্ম ও কোপেনহেগেনে অবস্থিত রয়াল বটানিক গার্ডেনের সুপারিনটেনডেন্ট ফ্রিডরিক লুডউইগ হলবোয়েল (১৭৬৫-১৮২৯) এর নামানুসারে ডেনমার্কের শল্যচিকিৎসক, ১৮১৫-১৮৪৬ সাল পর্যন্ত কলকাতার (শিবপুরের) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্ভিদ উদ্যানের (বর্তমান নাম ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান) সুপারিনটেনডেন্ট ন্যাথানিয়েল ওয়ালিচ (১৭৮৬-১৮৫৪) এই গণের নামকরণ করেন; তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের নাম হলো: 'টেন্টামেন ফ্লোরা নেপালেনসিস' (১৮২৪-২৬), 'প্ল্যান্টা এশিয়াটিকা রেরিওরেস' (১৮২০-১৮৩২) এবং সুপরিচিত "ওয়াল ক্যাট" (ডাক্তার ওয়ালিচের তত্ত্বাবধানে সংগৃহীত ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মিউজিয়ামে রক্ষিত উদ্ভিদদের শুষ্ক নমুনাগুলির সংখ্যাসূচক তালিকাকে ওয়ালিচ ক্যাটালগ বা সংক্ষেপে 'ওয়াল ক্যাট' বলে); উদ্ভিদ সংগ্রহের জন্য তিনি নেপাল ভ্রমণ করেন (১৮২০-১৮২২) এবং আসামে চা এর চাষ সম্ভব কিনা তদন্ত ও পরীক্ষা করার জন্য ১৮৩৩ সালে আসাম পরিদর্শন করেন।

এই গণে মোট ১০টি প্রজাতি; হিমালয়, চীন ও ইন্দোচীনের দেশগুলিতে জন্মায়; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২টি ও ১টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার প্রজাতিটির বাংলা নাম গোফল বা বাগুল।

নেলাম্বোনেসি (Nelumbonaceae) : পদ্ম গোত্র

প্যারিসে ঔষধবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপক জিন ব্যাপটিস্ট ডুমাস (১৮০০ -১৮৮৪) এই গোত্রটির নামকরণ করেন; নেলাম্বো গণটির নাম থেকেই গোত্রটির নাম।

এই গোত্রে একটি গণ ও ২টি প্রজাতি রয়েছে; উষ্ণমণ্ডলীয় এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় এদের বিস্তার; এরা বিরাট জলজ বহুবর্ষজীবী বীরুৎ; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি গণের অন্তর্গত ১টি প্রজাতি জন্মায়।

নেলাম্বো (Nelumbo) : ফরাসী উদ্ভিদবিজ্ঞানী, পরিব্রাজক, বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ও দার্শনিক মাইকেল অ্যাডানসন (১৮২৭-১৮০৬) এই গণের নামকরণ করেন; পদ্মফুলের সিংহলী নাম নেলাম্বো, এর থেকেই গণটির নামকরণ।

এই গণের ২টি প্রজাতি; ১টি হচ্ছে *নেলাম্বো পেন্টাপেটালা,* এই প্রজাতিটির বিস্তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব অঞ্চল থেকে দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া পর্যন্ত; অন্যটি

হচ্ছে *নেলাম্বো নুসিফেরা* (পদ্ম); প্রাপ্তিস্থান এশিয়া ও উত্তরপূর্ব অস্ট্রেলিয়া; এশিয়াতে পদ্মফুল পবিত্র বলে বিবেচনা করা হয়; হিন্দু দেবতা শিব ও দেবী লক্ষ্মীর অথবা গৌতমবুদ্ধের প্রিয় এই পদ্মফুল; এই প্রজাতিটি ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে মিশরে প্রবর্তিত হয়েছিল; এটি ভারতের জাতীয় ফুলের মর্যাদা পেয়েছে।

নিমফিয়েসি (Nymphaeaceae) : শালুক গোত্র

ইংরেজ উদ্ভিদবিজ্ঞানী, উদ্যাবিদ লন্ডনের হর্টিকালচারাল সোসাইটির সম্পাদক (১৮০৫-১৮১৬) রিচার্ড অ্যানথনি স্যালিসবারি (১৭৬১-১৮২৯) এই গোত্রটির নামকরণ করেন; নিমফিয়া গণের নাম থেকেই এই গোত্রের নাম হয়েছে; এই গোত্রের ৫টি গণ ও ৭৯ প্রজাতি রয়েছে; এরা বহুবর্ষজীবী জলজ উদ্ভিদ, বিশ্বের ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জন্মায়; ভারতে ৪টি গণ ও ১৪টি প্রজাতি জন্মায় বা চাষ হয়; পশ্চিমবাংলায় ৩টি গণ ও ৬টি প্রজাতি জন্মায় বা চাষ হয়, পশ্চিমবাংলার গণগুলি হলো :

ইউরায়েল (Euryale) : রিচার্ড অ্যানথনি স্যালিসবারি এই গণটির নামকরণ করেন; গ্রীক পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী সমুদ্র দেবতার ভয়ঙ্কর দেখতে তিনজন দানবী কন্যা ছিল; দানবী ত্রয় হচ্ছে এস্থেনো, ইউরায়েল ও মেডুসা, এদের মাথায় চুলের বদলে কতকগুলি জীবন্ত সাপ ছিল; ইউরায়েল থেকে এই গণের নামকরণ; এই গণের ১টি মাত্র প্রজাতি, জলজ ও সারা শরীর কাঁটায় ভর্তি, এর সঙ্গে তুলনা করে এই নাম।

প্রজাতিটির বিস্তার চীন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া; ভারতে এটি জন্মায়; এটির বাংলা নাম কাঁটাপদ্ম বা মাখনা।

নিমফিয়া (Nimphaea) : কার্ল ভন লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন; গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী সমুদ্র, পর্বত, বন প্রভৃতিতে অধিষ্ঠানকারিণী উপদেবী বা পরীদের 'নিম্ফ' বলা হয়; এর থেকেই গণটির নামকরণ।

মোট প্রজাতি ৫০টি; সকলেই জলজ বীরুৎ; পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জন্মায়; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৬টি ও ৩টি প্রজাতি জন্মায়; আরও কয়েকটি প্রজাতি শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসাবে চাষ করা হয়; পশ্চিমবাংলায় এদের শালুক বা শাপলা বলে, যেমন নীল, লাল, সাদা শালুক বা শাপলা।

ভিক্টোরিয়া (Victoria) : জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও উদ্যানবিদ মরিজ রিচার্ড স্কোমবার্গ (১৮১১-১৮৯১) এর বড় ভাই উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও পরিব্রাজক রবার্ট হারম্যান স্কোমবার্গ (১৮০৪-১৮৬৫) এই গণটির নামকরণ করেন; গ্রেট বৃটেনের রানী ভিক্টোরিয়ার (১৮১৯-১৯০১) নামানুসারে গণটির নামকরণ; রানী ভিক্টোরিয়া জল লিলির নাম ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা; ১৮০০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী হেয়েনকে আমাজন নদীর একটি উপনদী মেমোরে থেকে এই প্রজাতিটি আবিষ্কার করেন; ১৮৪৬ সালে থমাস ব্রিজেস (১৮০৭-১৮৬৫) বলিভিয়া থে লণ্ডনের কিউ বাগানে এটিকে চাষের জন্য প্রথম প্রবর্তন করেন; এই শতাব্দীর ত্রিশ বা চল্লিশের দশকে ভারতে তথা শিবপুরের ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে এদের চাষ শুরু হয়; এই উদ্ভিদের ভাসন্ত পাতার ব্যাস ২ মিটার পর্যন্ত হয় এবং ৬-৭ বছরের শিশুর ভার বহন করতে পারে।

মোট প্রজাতি ২ বা ৩টি; বিস্তার উষ্ণমণ্ডলীয় দক্ষিণ আমেরিকা; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ২টি প্রজাতি শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসাবে বাগানে চাষ হয়; পশ্চিমবাংলায় প্রজাতি দুটির বাংলা নাম আমাজন পদ্ম ও সান্তাক্রুজ পদ্ম।

প্যাপাভারেসি (Papaveraceae) : পোস্ত বা আফিম গোত্র

ফরাসী উদ্ভিদবিজ্ঞানী এ্যানটয়নে লরেন্ট ডি জুসিউ (১৭৪৮-১৮৩৬) এই গোত্রের নামকরণ করেন; প্যাপাভার গণটির নাম থেকেই গোত্রটির নাম।

এই গোত্রে ২৬টি গণ ও ২০০টি প্রজাতি রয়েছে; উত্তর নাতিশীতোষ্ণ ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত; অধিকাংশ প্রজাতি বীরুৎ এবং তরুক্ষীর (ল্যাটেক্স) যুক্ত; দুটি গণের প্রজাতিরা গুল্ম অথবা ছোট বৃক্ষ হয়; ভারতে ৫টি গণ ও ২৭টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলায় ৪টি গণ ও ৯টি প্রজাতি জন্মায় বা চাষ হয়; পশ্চিমবাংলার গণগুলি হলো

আর্জেমনে (Argemone) : কার্ল ভন লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন;

গ্রীক 'আরজেমন' শব্দটির অর্থ চোখের ছানি; চোখের ছানি নিরাময়ে এই গণের প্রজাতিদের ব্যবহার হয় বলে কথিত আছে; এদের সাধারণভাবে 'কাঁটা পপি' বা 'মেক্সিকো পপি' বলা হয়।

মোট প্রজাতি ১০টি; পশ্চিম ও পূর্ব্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় জন্মায় এমন ২টি প্রজাতি বিদেশী; একটি প্রজাতির বাংলা নাম শিয়ালকাঁটা; এটি আমেরিকা থেকে এদেশে প্রবর্তিত হয়েছে।

এস্চকলজিয়া (Eschscholzia) : ফ্রান্সে জন্ম জার্মান কবি, লেখক ও প্রকৃতিবিদ্ লুডল্ফ এ্যাডেলবার্ট ভন চ্যামিসো (১৭৮১-১৮৩৮) এই গণের নামকরণ করেন; শল্য চিকিৎসক ও প্রকৃতিবিদ্ জোহান ফ্রিডরিখ এসকলজ (১৭৯৩-১৮৩১) এর নামানুসারে এই গণের নামকরণ হয়েছে।

মোট ১০টি প্রজাতি; প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তর আমেরিকায় এরা জন্মায়; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় একটি প্রজাতি বাগানে শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসাবে চাষ হয়; একে বলা হয় 'ক্যালিফরনিয়া পপি', এটি বিদেশী।

মেকনপসিস (Meconopsis) : ফরাসী চিকিৎসক এল. জি. আলেকজান্ডার ভিগুয়ের (১৭৯০-১৮০৭) এই গণটির নামকরণ করেন; গ্রীক 'মেকন' ও 'অপসিস' শব্দদ্বয়ের অর্থ আফিম বা পপি ও সাদৃশ্য; অর্থাৎ আফিম গাছের সঙ্গে এই উদ্ভিদগুলির সাদৃশ্য আছে।

১টি প্রজাতি পশ্চিম ইউরোপ ও ৪২টি হিমালয় থেকে পশ্চিম চীন পর্যন্ত বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১৬ ও ৪টি প্রজাতি পার্বত্য অঞ্চলে জন্মায়।

প্যাপাভার (Papaver) : কার্ল ভন লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন; ল্যাটিন 'প্যাপা' শব্দের অর্থ গাঢ় দুধ; ল্যাটিন নাম 'পপি' র অন্তর্গত প্রজাতিগুলি হচ্ছে 'অপিয়াম পপি', 'ওরিয়েন্টাল পপি', 'লাল বা মাঠ পপি', 'কালো পপি'।

মোট ১০০টি প্রজাতি; ইউরোপ, এশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকায় বিস্তৃত; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় ২টি প্রজাতি চাষ হয়, একটি শোভাবর্ধক হিসাবে, অন্যটি আফিম বা পোস্তর জন্য, শোভাবর্ধক প্রজাতিটির নাম লাল পোস্ত; ঔষধে আফিমের ব্যবহারের জন্য প্রাচীন কাল থেকেই ভারতে, চীনে, গ্রীসে ও রোমান সভ্যতার সময় থেকেই এই উদ্ভিদটির চাষ হচ্ছে; গ্রীক ও রোমানরা রুটি ও কেকে স্বাদবৃদ্ধির জন্য পোস্ত ব্যবহার করত; প্রাচীন গ্রীসে অলিম্পিক খেলাধূলার সময় শিক্ষানবিস ক্রীড়াবিদরা মধু ও মদের সঙ্গে পোস্ত মিশিয়ে খেত; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় পোস্ত রান্না করে খাওয়া হয়; পোস্ত গাছ থেকে উৎপন্ন যন্ত্রনা লাঘবকারী ঔষধগুলি হলো : মরফিন, কোডেইন, হিরোইন, কোডোমাইন, প্যাপাভারিন; আফিম হচ্ছে *প্যাপাভার সমনিফেরাম* উদ্ভিদ প্রজাতিটির ফলের গাত্র থেকে নির্গত ল্যাটেক্স; এই উদ্ভিদের ফলের বীজ হচ্ছে পোস্ত।

ফিউমারিয়েসি (Fumariaceae) : বন সলফো বা পিত পাপরা গোত্র

জেনেভায় সুইজারল্যান্ডের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী আগাস্টিন পিরেমাস ডি ক্যাণ্ডোলে (১৭৭৮-১৮৪১) এই গোত্রটির নামকরণ করেন; ফিউম্যারিয়া গণের নাম থেকে গোত্রটির নাম।

মোট ১৬টি গণ ও ৪৫০ টি প্রজাতি রয়েছে; পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জন্মায়, কিছু পূর্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকাতেও জন্মায়; ভারতে ৪টি গণ ও ৬৫টি প্রজাতি রয়েছে, পশ্চিমবাংলায় ৩টি গণ ও ৭টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার গণগুলি হলো :

করিড্যালিস (Corydalis) : ফরাসী ধর্মযাজক, গ্রন্থাগারিক ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী এলিয়েনে পিয়েরে ভেন্টেন্যাট (১৭৫৭-১৮০৮) এই গণটির নামকরণ করেন; গ্রীক 'করুড্যালোস' শব্দের

অর্থ একটি লার্ক অর্থাৎ লার্কস্পার উদ্ভিদের স্পার এর সঙ্গে এই উদ্ভিদগুলির স্পারের সাদৃশ্য রয়েছে বলে এই নামকরণ।

মোট প্রজাতি ৩২০টি; উত্তর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে এবং ১টি প্রজাতি উষ্ণমণ্ডলীয় পূর্ব আফ্রিকায় বিস্তৃত; অধিকাংশ প্রজাতি বহুবর্ষজীবী, মূলকন্দ সমেত বীরুৎ; একটি প্রজাতি আকর্ষযুক্ত আরোহী ও বর্ষজীবী; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৫৩ ও ৩টি প্রজাতি পার্বত্য অঞ্চলে জন্মায়।

ডিসেন্ট্রা (Dicentra) : জার্মান প্রকৃতিবিদ্ মরিস বালথাসার বরখাউসেন (১৭৬০-১৮০৬) এই গণের নামকরণ করেন; গ্রীক 'ডাই' এবং 'কেনট্রন' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে দুই ও স্পার, এই গণের প্রজাতিদের ফুলে দুটি করে স্পার থাকে বলে এই নাম।

মোট ২০টি প্রজাতি; পশ্চিম হিমালয় থেকে পূর্ব সাইবেরিয়া, সাখালিনদ্বীপ, জাপান, পশ্চিম চীন ও উত্তর আমেরিকায় বিস্তৃত; সব প্রজাতিই বীরুৎ; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৬ ও ৩টি প্রজাতি জন্মায়, 'ব্লিডিং হার্ট' প্রজাতিটি বাগানে চাষ হয়।

ফিউমারিয়া (Fumaria) : কার্ল লিনিয়াস এই গণের নামকরণ করেন; ল্যাটিন 'ফিউমাস' শব্দের অর্থ ধোঁয়া; কয়েকটি প্রজাতির ধোঁয়ার মত গন্ধ রয়েছে বলে এই নাম, সাধারণভাবে এদের 'ফিউমিটরি' বলা হয়; প্রাচীন গ্রীকরা বিশ্বাস করত মাটি থেকে নির্গত বাষ্প থেকে এই গাছের উদ্ভব হয়েছে।

মোট প্রজাতি ৫৫টি; ইউরোপ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে মধ্য এশিয়া ও হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ৪ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার প্রজাতিটির বাংলা নাম বনসল্ফ বা বনসলফো, হিন্দি নাম পিতপাপরা, বাংলায় পিতপাপরা অন্য গাছ।

ব্র্যাসিকেসি (Brassicaceae) : সরিষা গোত্র

ইংরেজ উদ্ভিদবিদ গিলবার্ট বারনেট (১৮০০-১৮৩৫) এই গোত্রের নামকরণ করেন; এই গোত্রের অপর নাম ক্রুসিফেরী; এই গোত্রের অধীনে ৩৭৫টি গণ ও ৩২০০টি প্রজাতি রয়েছে; প্রধানতঃ উত্তর গোলার্ধের বিশেষ করে ঠাণ্ডা অঞ্চলে বিস্তৃত; ব্যবহারিক দিক থেকে এই গোত্র অতিশয় মূল্যবান, বিভিন্ন প্রকার সরিষা, কপি, মূলো ইত্যাদি এই গোত্রের প্রজাতি, ব্র্যাসিকা গণ থেকেই এই গোত্রের নামকরণ; ভারতে ৬৪টি গণ ও ২০৭টি প্রজাতি এবং পশ্চিমবাংলায় ১৫টি গণের ৩২টি প্রজাতি ও উপপ্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলায় গণগুলি হলো:

***ব্র্যাসিকা* (Brassica) :** কার্ল ভন লিনিয়াস এই গণের নামকরণ করেন; কেলটিক শব্দ 'ব্রেসিক' থেকে ল্যাটিন নাম 'ব্র্যাসিকা' র উদ্ভব; ব্রেসিক শব্দের অর্থ বাঁধাকপি, বিভিন্ন প্রকার সরিষা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি ও শালগম প্রভৃতি প্রজাতিরা এই গণের অন্তর্গত।

মোট ৪০টি প্রজাতি; ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিস্তৃত, ভারতে ২৬টি প্রজাতি, উপপ্রজাতি ও প্রকার চাষ হয়, পশ্চিমবাংলায় ৯টি প্রজাতি, উপপ্রজাতি ও প্রকার চাষ হয়।

ক্যাপসেলা (Capsella) : জার্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ফ্রিডরিক কাসিমির মেডিকুস (১৭৩৬-১৮০৮) এই গণটির নামকরণ করেন; ল্যাটিন 'ক্যাপসেলা' শব্দের অর্থ ছোট বাক্স, গণটির প্রজাতিদের ফলের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার জন্য এই নাম।

মোট প্রজাতি ৫টি; নাতিশীতোষ্ণ ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে জন্মায়; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি জন্মায়।

কার্ডামাইন (Cardamine) : কার্ল ভন লিনিয়াস এই গণের নামকরণ করেন; এই গণের উদ্ভিদদের তেতো ক্রেশ বা কোকিল ফুল বলে।

মোট ১৬০টি প্রজাতি; মূলতঃ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জন্মায়; ভারত ও পশ্চিমবাংলার পার্বত্য অঞ্চলে যথাক্রমে ১৪ ও ৪টি প্রজাতি জন্মায়।

ককলিয়ারিয়া (Cochlearia) : গণটির নামকরণ করেন কার্ল লিনিয়াস; ল্যাটিন 'ককলিয়ার' শব্দের অর্থ চামচ, এই গণের উদ্ভিদদের পাতা চামচ সদৃশ বলে এই নাম; মধ্যযুগে ইউরোপে কয়েকটি প্রজাতি ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হত, একটি প্রজাতিকে 'স্কার্ভি ঘাস' বলে।

মোট ২৫টি প্রজাতি, উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, পূর্ব হিমালয় ও জাভা পার্বত্য অঞ্চলে বিস্তৃত; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়।

করোনোপাস (Coronopus) : গোয়েটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যাপক জোহান গটফ্রেড জিন (১৭২৭-১৭৫৯) এই গণের নামকরণ করেন; গ্রীক 'করোনা' ও 'পাউস' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে কাক ও পায়ের পাতা, এই গনের উদ্ভিদদের পাতাগুলি গভীরভাবে খণ্ডিত ও কাকের পায়ের পাতার মত দেখতে বলে এই নামকরণ।

মোট প্রজাতি ১০টি; প্রায় সব দেশেই জন্মায়; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি জন্মায়।

কাইর‍্যান্থাস (Cheiranthus) : গণটির নামকরণ করেন কার্ল ভন লিনিয়াস; গ্রীক 'কিয়ার' ও 'এ্যানথোস' শব্দ দ্বয়ের অর্থ একটি হাত ও ফুল; এই উদ্ভিদের ফুল হাতে করে নিয়ে যাওয়ার রীতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

মোট ১০টি প্রজাতি; ভূমধ্যসাগরীয় ও উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জন্মায়; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় বিদেশ থেকে আগত ১টি প্রজাতি সুগন্ধ যুক্ত ফুলের জন্য বাগানে চাষ করা হয়, একে 'ওয়াল ফ্লাওয়ার' বলে।

ড্রাবা (Draba) : কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন; গ্রীক 'ড্রাবে' শব্দের অর্থ অতিশয় কটু, এই উদ্ভিদদের পাতার স্বাদের সঙ্গে তুলনীয়; রোম সম্রাট নীরোর সামরিক চিকিৎসক ডাইয়োসকরাইডেস প্রথম এই নামটি প্রচলন করেন।

প্রায় ৩০০টি প্রজাতি, উত্তর নাতিশীতোষ্ণ, উত্তর মেরু, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার পার্বত্য অঞ্চলে এদের বিস্তার; ভারত ও পশ্চিমবাংলার পার্বত্য অঞ্চলে যথাক্রমে ৩৩ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়।

এরুকা (Eruca) : ব্রিটিশ উদ্যানবিদ্ ঔষধাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় সংক্রান্ত সোসাইটির সুপারিন্টেন্ডেন্ট ফিলিপ মিলার (১৬৯১-১৭৭১) গণটির নামকরণ করেন।

মোট ৬টি প্রজাতি; ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, উত্তর পূর্ব আফ্রিকায় এদের বিস্তার, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি চাষ হয় বা আগাছা হিসাবে জন্মায়, প্রজাতিটির বাংলা ও হিন্দি নাম শ্বেতসরিষা, তারানুরি, তারামিরা; ইংরেজী নাম 'ডামেস রকেট' বা 'ভেসপার ফুল'; এর বীজ থেকে খাদ্যযোগ্য তেল তৈরী হয়, গাছটিও খাদ্যযোগ্য ও স্যালাড হিসাবে খাওয়া হয়।

ইবারিস (Iberis) : এই গণটির নামকরণ করেন কার্ল লিনিয়াস; প্রাচীনকালে স্পেন ও পর্তুগাল দেশ দুটিকে নিয়ে গঠিত ইবারিয়ান পেনিনশুলার নাম থেকে গ্রীক ইবারিস শব্দের উৎপত্তি; এদের সাধারণভাবে 'ক্যাণ্ডিটাফট' বলে; ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন নাম ক্যান্ডিয়া থেকে 'ক্যাণ্ডিটাফট' নামটির উৎপত্তি; এই দ্বীপে ভীষণ সুগন্ধযুক্ত গুচ্ছবদ্ধ সাদা ফুলের *ইবারিস ওডোরাটা* প্রজাতিটির আদি বাসস্থান।

এই গণে মোট প্রজাতি ৩০টি; ইউরোপ ও এশিয়ায় এরা বিস্তৃত; ভারতে ৪টি ও পশ্চিমবাংলায় ২টি প্রজাতি মরসুমী ফুল হিসাবে চাষ হয়।

লেপিডিয়াম (Lepidium) : গণটির নামকরণ করেন কার্ল ভন লিনিয়াস; এই নামটি বাগান ক্রেশের প্রাচীন নাম, গ্রীক 'লেপিস' শব্দের অর্থ স্কেল, এই উদ্ভিদদের শুঁটি স্কেলের মত বলে এই নামকরণ; এর প্রজাতিদের পেপার ঘাস বলে; *লেপিডিয়াম স্যাটিভাম* প্রজাতিটির সাধারণ নাম গার্ডেন ক্রেশ বা বাগান ক্রেশ; মোট প্রজাতি ১৫০টি, বিস্তার বিশ্বজনীন; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় ১০ ও ৩টি প্রজাতি জন্মায় বা চাষ হয়।

লবুলারিয়া (Lobularia) : ফরাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নিকাইসে অ্যাঙ্গাস্টে ডেসভক্স (১৭৮৪-১৮৫৬) এই গণটির নামকরণ করেন; ল্যাটিন 'লবুলাস' শব্দের অর্থ ছোট খণ্ড, এর উদ্ভিদগুলির ফলের সঙ্গে ইহা তুলনীয় বলে এই নাম এবং উদ্ভিদদের সাধারনভাবে 'সুইট এ্যালিসাম' বলে।

মোট ৫টি প্রজাতি; ভার্দে ও ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও আরবদেশে এদের বিস্তার; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি মরসুমী ফুল হিসাবে চাষ হয়।

ম্যাথিওলা (Mathiola) : স্কটল্যান্ডে জন্ম, লিনিয়ান সোসাইটির গ্রন্থাগারিক, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রথম রক্ষক, ব্রিটিশ চিকিৎসক ও খ্যাতনামা উদ্ভিদবিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন (১৭৭৩-১৮৫৮) এই গণটির নামকরণ করেন, তিনি চিকিৎসক রূপে ও প্রকৃতিবিদ্ হিসাবে অস্ট্রেলিয়ায় গমন করেন; ইটালির চিকিৎসক ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী এবং অস্ট্রিয়ার ফার্ডিন্যান্ডের চিকিৎসক ও ডাইয়োসকরাইডেস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পিয়্যান্ডিয়া ম্যাথিওলি (১৫০০-১৫৭৭) স্মরণে এই গণের নামকরণ হয়েছে।

মোট প্রজাতি ৫৫টি; আটলান্টিক দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম ইউরোপ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকায় এদের বিস্তার; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২ ও ১টি প্রজাতি জন্মায় বা চাষ হয়; পশ্চিমবাংলার প্রজাতিটির ইংরেজী নাম 'গিল ফ্লাওয়ার', বাংলা নাম

ন্যাস্টারসিয়াম (Nasturtium) : রবার্ট ব্রাউন এই গণের নামকরণ করেন; সরিষা গোত্রের কয়েকটি প্রজাতির প্রাচীন নাম ন্যাস্টারসিয়াম।

মোট ৫টি প্রজাতি; ইউরোপ, মধ্যএশিয়া, আফগানিস্থান, উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকার ক্রান্তীয় পার্বত্য অঞ্চল ও উত্তর আমেরিকায় এদের বিস্তার; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিটির বাংলা নাম জলক্রেশ।

র‍্যাফানাস (Raphanus) : কার্ল ভন লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন; গ্রীক 'র‍্যাফানিস' শব্দ থেকে ল্যাটিন নাম র‍্যাফানাস উদ্ভূত, গ্রীক 'র‍্যা' ও 'ফাইনোমাই' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে শীঘ্র ও আবির্ভূত হওয়া, এই গনের উদ্ভিদদের বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় বলে এই নাম।

মোট ৮টি প্রজাতি; পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত এদের বিস্তার; ভারতে দুটি প্রজাতি জন্মায় বা চাষ হয়, পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি চাষ হয় যার বাংলা নাম মূলো।

রোরিপা (Rorippa) : অস্ট্রিয়া-ইটালির চিকিৎসক, রসায়নবিদ্ ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী জোয়ানেশ এ্যান্টোনিয়াম স্কোপোলি (১৭২৩-১৭৮৮) এই গণের নামকরণ করেন; পূর্ব জার্মানির স্থানীয় নাম 'রোরিপেন' থেকে ল্যাটিন নামটির উদ্ভব।

মোট প্রজাতি ৭০টি; পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র, বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ ও ক্রান্তীয় পার্বত্য অঞ্চলে জন্মায়; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৭ ও ৫টি প্রজাতি জন্মায়।

ক্যাপারিডেসি (Capparidaceae) : হুরহুরে বা বাখনাই গোত্র

ফরাসি উদ্ভিদবিদ্ বার্ণাড ডি জুসিউর ভ্রাতুষ্পুত্র, উদ্ভিদের নূতন স্বাভাবিক শ্রেণীবিন্যাসের পথিকৃৎ বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী এ্যানটয়নে লরেন্ট ডি জুসিউ (১৭৪৮-১৮৩৬) এই গোত্রের নামকরণ করেন; এই গোত্রের অপর নাম ক্যাপারেসি; ক্যাপারিস গণের নাম থেকে গোত্রটির নাম।

গোত্রটিতে মোট ৩০টি গণ ও ৬৫০টি প্রজাতি রয়েছে; এরা পৃথিবীর ক্রান্তীয় ও উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বিস্তৃত; প্রজাতিরা ছোট বৃক্ষ, গুল্ম ও কখনও আরোহী ও বীরুৎ হয়; অনেক গনের প্রজাতিদের কাঁটা থাকে; ভারতে ৭টি গণের অধীনে ৫৫টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলায় ৪টি গণ ও ১৮টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার গণগুলি হলো:

ক্যাপারিস (Capparis) : কার্ল ভন লিনিয়াস এই গণের নামকরণ করেন; 'ক্যাব্রা' একটি আরবিক ও উর্দুনাম, গ্রীক 'ক্যাপারাম' শব্দটি আরবীয় নাম থেকে উদ্ভূত; *ক্যাপারিস স্পাইনোসা* প্রজাতির লবণে জরানো কুঁড়িকে 'ক্যাপারস' বলে।

মোট প্রজাতি ২৫০টি; পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে জন্মায়; অনেক প্রজাতি বাঁকানো কাঁটার সাহায্যে আরোহী হয়, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২৯ ও ৮টি প্রজাতি জন্মায়। বাখনাই প্রজাতিটি সমতলে বিভিন্ন জেলায় জন্মায়।

ক্লিওম (Cleome) : কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন; ল্যাটিন 'ক্লিও' শব্দের অর্থ বন্ধ করা, ফুলের অংশের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, বিশ্বাস করা হতো যে ৪র্থ শতাব্দীর একজন রোমান চিকিৎসক অক্টোভিয়াস হোরাটিয়াস 'সাইন্যাপসিস' এর মত দেখতে উদ্ভিদদের জন্য এই নাম ব্যবহার করেছিলেন।

মোট প্রজাতি ১০০টি; ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত; সাধারণভাবে এদের ইংরেজীতে 'স্পাইডার ফ্লাওয়ার' বলা হয়, বাংলা নাম মাকড়সা ফুল; হুরহুরে প্রজাতিটি খুবই উপকারী উদ্ভিদ; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১৫টি ও ৬টি প্রজাতি জন্মায়।

ক্র্যাটাভা (Crataeva) : গণটির নামকরণ করেন কার্ল ভন লিনিয়াস; খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর প্রথম পর্বে হিপোক্র্যাটেসের সময় জীবিত একজন গ্রীক উদ্ভিদবিদ্ ক্র্যাটেভাস এর নাম অনুসারে এই গণের নামকরণ হয়েছে।

মোট প্রজাতি ৯টি; বিস্তার অস্ট্রেলিয়া ব্যতীত ক্রান্তীয় অঞ্চল; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৪ ও ৩টি প্রজাতি জন্মায়; বরুন প্রজাতিটি শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসাবে বাগানে বসানো হয়।

স্টিক্সিস (Stixis) : পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারক ও প্রকৃতিবিদ্ জোয়াওদে লওরিরো (১৭১৭-১৭৯১) এই গণটির নামকরণ করেন; তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম 'ফ্লোরা কোচিনচাইনেন্‌সিস'।

মোট ৭টি প্রজাতি; বিস্তার ভারতের পূর্ব হিমালয় থেকে ইন্দোচীনের দেশ সমূহ, চীনের হাইনান, পশ্চিম মালয়েশিয়া, লেসারসুন্দা দ্বীপপুঞ্জ; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি জন্মায়; বাংলা নাম হলদে মধুমালতী।

রেসেডেসি (Resedaceae) : *মিগনোনেটে গোত্র*

ইংরেজ প্রকৃতিবিদ্ উদ্ভিদ ও ঔষধবিদ্যার অধ্যাপক স্যামুয়েল ফ্রিডারিক গ্রে (১৭৬৬-১৮২৮) এই গোত্রের নামকরণ করেন; রেসিডা গণের নাম থেকে এই গোত্রের নাম।

এই গোত্রে মোট ৬টি গণ ও ৭০টি প্রজাতি বর্তমান; বিস্তার মুলতঃ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা, ইউরোপ থেকে মধ্য এশিয়া, ভারত, ক্যালিফোর্নিয়ায় বিস্তৃত; উদ্ভিদগুলি বর্ষ বা বহুবর্ষজীবী বীরুৎ অথবা গুল্ম; ভারতে ২টি গণ ও ৫টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলায় ১টি গণের ২টি প্রজাতি চাষ হয়।

রেসেডা (Reseda) : গণটির নাম করেন কার্ল লিনিয়াস; ল্যাটিন 'রেসিডো' শব্দের অর্থ আরোগ্য হওয়া বা করা; এই গণের উদ্ভিদের আঘাত জনিত ক্ষত থেকে আরোগ্য হওয়ার গুণ আছে বলে এই নাম।

মোট প্রজাতি ৬০টি; বিস্তার ইউরোপ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে মধ্যএশিয়া ও ভারতবর্ষ; সাধারণভাবে এদের মিগনোনেটে ফুল বলে; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৩ ও ২টি প্রজাতি সুন্দর ফুলের জন্য চাষ হয়।

পশ্চিমবাংলা পরিচিতি

ভৌগলিক অবস্থান ও প্রশাসনিক বিভাগ

স্যার ডেভিড প্রেন ১৯০৩ সালে 'বেঙ্গল প্ল্যান্ট' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে তৎকালীন বাংলা প্রদেশের সীমা ছিল পশ্চিমে বিহারের সোন নদী, দক্ষিণ পশ্চিমে উড়িষ্যার মহানদী এবং পূর্বে ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের নূতন অঙ্গরাজ্য রূপে পশ্চিমবাংলার সৃষ্টি হয়। তার পরে বিহার থেকে পূর্ণিয়ার কিছু অংশ ও পুরুলিয়া পশ্চিমবাংলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে বর্তমানে পশ্চিমবাংলার সীমান্ত নির্ধারিত হয়েছে।

পৃথিবীর মানচিত্রে পশ্চিমবাংলার অবস্থান ২১°৩৮' থেকে ২৭°১০' উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৫°৫০' থেকে ৮৯°৫০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। কর্কটক্রান্তি শান্তিনিকেতনের খুব কাছ দিয়ে বর্ধমান জেলার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবাংলা ভারতের পূর্বাংশে অবস্থিত ইহার একটি রাজ্য। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তরে সিকিম ও ভুটান, পশ্চিমে নেপাল, বিহারের পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগনা, মানভূম, সিংভূম জেলা, উড়িষ্যার বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ জেলা, পূর্বে আসাম রাজ্য ও বাংলাদেশ।

পশ্চিমবাংলার বর্তমান আয়তন ৮৮,৭৫২ বর্গকিলোমিটার, ইহা তিনটি বিভাগের অন্তর্গত কলকাতা সহ বর্তমানে ১৮ টি জেলায় বিভক্ত। জেলাগুলি হল দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলি, পুরুলিয়া, বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া ও কলকাতা। জেলাগুলির আয়তন অন্যত্র দেওয়া হয়েছে। এই সব জেলার বিশেষ বিশেষ শহর, অঞ্চল জেলাওয়ারি দেওয়া হল।

দার্জিলিং	:	দার্জিলিং, সুখিয়াপোখরি, জোড়বাংলো, সেঞ্চল, টাইগারহিল, বার্চহিল, মনিভঞ্জন টংলু, ফালুট, সান্দাখফু, ঘুম, কালিম্পং, গরুবাথান, লাভা, মিরিক, কার্শিয়াং, ফাঁসিদেওয়া, শিলিগুড়ি, জোরপখরী।
জলপাইগুড়ি	:	আলিপুরদুয়ার, রাজগঞ্জ, ময়নাগুড়ি, নাগরাকাটা, ধূপগুড়ি, মাদারিহাট, কুমারগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বীরপাড়া, ফালাকাটা, জলদাপাড়া, বক্সা, চাপরামারি।
কোচবিহার	:	কুচবিহার, তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ী।
উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর	:	রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, ইটাহার, তপন, কুমারগঞ্জ, হিলি, করনদিঘি, ইসলামপুর, চাকালিয়া, বংশিহারি।

পশ্চিমবাংলা (রাজনৈতিক)

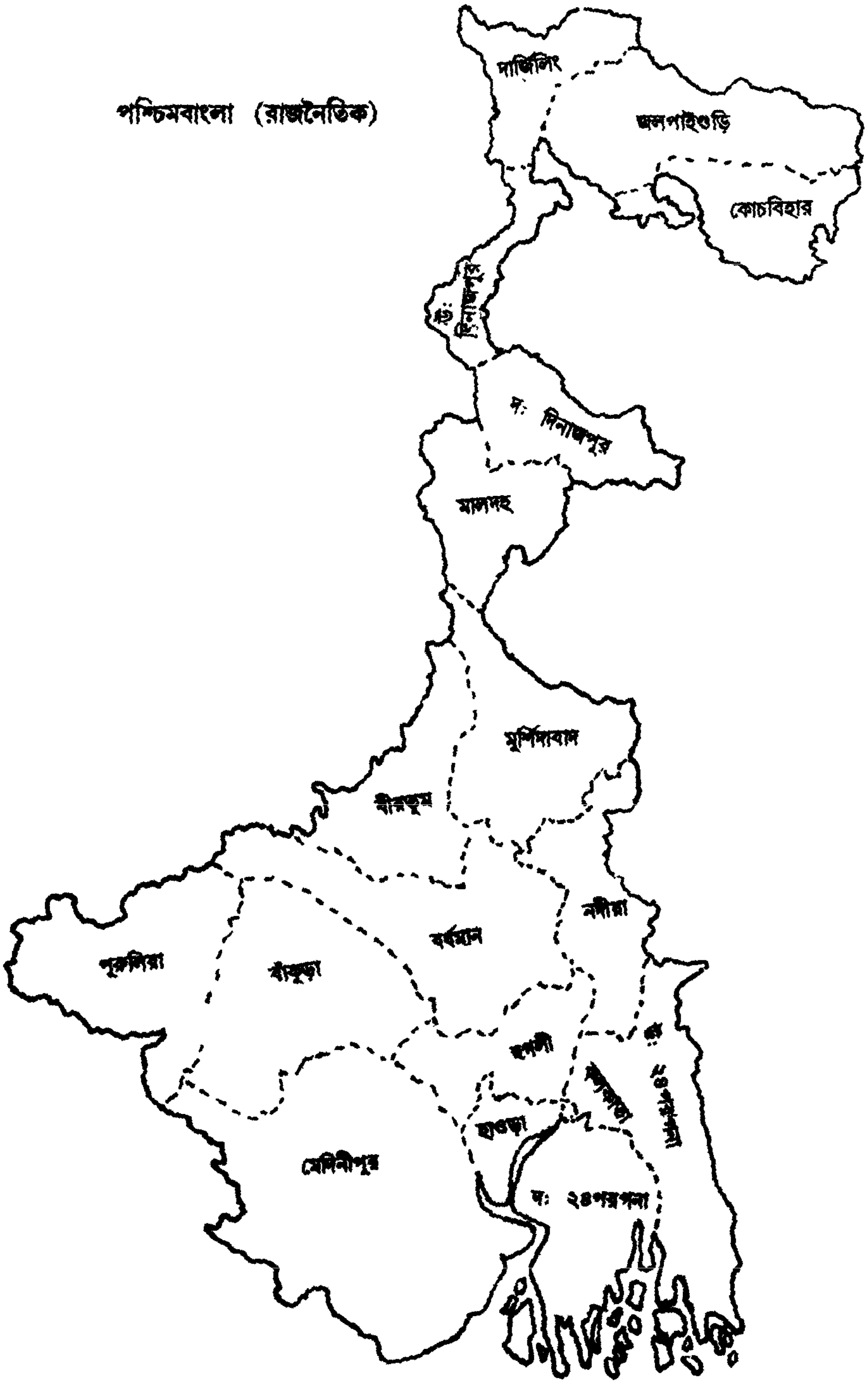

মালদা : মালদা, ইংরেজবাজার, হাবিবপুর, কালিয়াচক, চাঁচল, বামনগোলা, মানিকচক, গাজোল, হরিশ্চন্দ্রপুর।

মুর্শিদাবাদ : ডোমকল, খড়গ্রাম, বেলডাঙ্গা, নবগ্রাম, কান্দি, বহরমপুর, ভরতপুর, ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জ, নওদা, হরিহরপুর, সূতী, সাগরদীঘি, রঘুনাথগঞ্জ, জলঙ্গী, ফরাক্কা, লালগোলা।

বীরভূম : বোলপুর, রাজনগর, সাঁইথিয়া, নলহাটি, মহম্মদবাজার, দুবরাজপুর, সিউড়ি, ময়ূরেশ্বর, রামপুরহাট, নানুর, লাভপুর, ইলামবাজার, বল্লভপুর।

বর্ধমান : কাটোয়া, বর্ধমান, মঙ্গলকোট, মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলি, কালনা, মেমারি, জামালপুর, ভাতাড়, গলসি, আউসগ্রাম, আসানসোল, ফরিদপুর, রানীগঞ্জ, অণ্ডাল, হীরাপুর, বড়বনি, কুলটি, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর, রামবাগান।

বাঁকুড়া : সিমলাপাল, খাতড়া, মেজিয়া, বিষ্ণুপুর, বড়জোড়া, জয়পুর, গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া, কোতুলপুর, শালতোড়া, রায়পুর।

পুরুলিয়া : রঘুনাথপুর, ঝালদা, হুরা, বন্দোয়ান বা বরাভূম, কাশিপুর, পুরুলিয়া, বাঘমুন্ডি, খালবাজার, বলরামপুর, সাঁওতালডিহি, অযোধ্যা পাহাড়।

নদীয়া : কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট, কালিগঞ্জ, তেহট্ট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, চাপড়া, হরিণঘাটা, কৃষ্ণনগর, চাকদা, করিমপুর, হাঁসখালি, কল্যানী, বেথুয়াডহরি।

মেদিনীপুর : জামবনি, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, ময়না, পিংলা, পাঁশকুড়া, নন্দীগ্রাম, ডেবরা, ঘাটাল, কন্টাই বা কাঁথি, এগরা, দাঁতন, চন্দ্রকোনা, ভগবানপুর, মহিষাদল, নারায়ণগঞ্জ, তমলুক, মোহনপুর, দাসপুর, রামনগর, ঝাড়গ্রাম, শাল্‌বনী, বীনপুর, কেশপুর, সুতাহাটা, সবং, গড়বেতা, মেদিনীপুর, খড়্গপুর, বেলদা, হলদিয়া, দীঘা, কলাইকুন্ডা, জুনপুট।

হুগলি : গোঘাট, জঙ্গীপাড়া, আরামবাগ, খানাকুল, পুরশুড়া, বলাগড়, পোলবা, হরিপাল, চণ্ডীতলা, পাণ্ডুয়া, সিঙ্গুর, ধনিয়াখালি, তারকেশ্বর, মগরা, ভদ্রেশ্বর, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, চন্দননগর।

হাওড়া : হাওড়া, বাগনান, শ্যামপুর, উলুবেড়িয়া, সাঁকরাইল, বালি, বাউড়িয়া, ডোমজুড়, জগৎবল্লভপুর, আমতা, উদয়নারায়ণপুর, পাঁচলা, লিলুয়া।

উত্তর ও দক্ষিন ২৪ পরগনা : সন্দেশখালি, বীজপুর, বসিরহাট, নৈহাটি, বনগাঁ, স্বরূপনগর, বাগদা, গাইঘাটা, মগরাহাট, ডায়মণ্ডহারবার, কুলপী, দেগঙ্গা, পাথরপ্রতিমা, বাসন্তী, সাগর, ফলতা, হাবড়া, আমডাঙ্গা, রাজারহাট, বারাসাত, জগদ্দল, ব্যারাকপুর, টিটাগড়, বেলঘরিয়া, বরানগর, দমদম, নিমতা, সল্ট লেক, গার্ডেনরিচ, মহেশতলা, বজবজ, বিষ্ণুপুর, কসবা, সোনারপুর, বারুইপুর, ক্যানিং, জয়নগর, লক্ষীকান্তপুর, কাকদ্বীপ, নামখানা, হাসনাবাদ, গোসাবা, লোথিয়ানদ্বীপ, জম্বুদ্বীপ, নরেন্দ্রপুর, সজনেখালি, ভগৎপুর, পারমাদন, হলিডেদ্বীপ।

প্রাকৃতিক গঠন

অধ্যাপক আর, এল, সিং এর মতে দার্জিলিং ও পুরুলিয়া জেলা বাদে সমগ্র পশ্চিমবাংলা নিম্ন গাঙ্গেয় সমতলভূমির অন্তর্গত। যদিও সমগ্র অঞ্চলটি বদ্বীপীয় বলে মনে করা হয়, তবুও প্রকৃত বদ্বীপীয় অঞ্চলটি সমগ্র অঞ্চলের দুই তৃতীয়াংশ এবং রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণে অবস্থিত। কেউ কেউ বলেন ইহাই সম্ভবতঃ সারা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বদ্বীপীয় অঞ্চল (অবশ্য বাংলাদেশকে ধরে)।

নিম্ন গাঙ্গেয় সমতলভূমির অবস্থান ২১°২৫ থেকে ২৬°২৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬°৩০ থেকে ৮৯°৫৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। আয়তন ৮০,৯৬৮ বর্গকিলোমিটার; দার্জিলিং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রায় ৫৮০ কিলোমিটার বিস্তৃত। ছোটনাগপুর মালভূমির প্রান্ত থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় ২০০ কিলোমিটার প্রশস্ত। নিম্ন গাঙ্গেয় সমতলভূমির উত্তরপ্রান্তে রয়েছে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা, পশ্চিমপ্রান্তে রয়েছে বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় ১৫০ মিটার, সমগ্র অঞ্চলের দুই তৃতীয়াংশ ভূমি যেমন কুচবিহার, উভয় দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলি, বীরভূম, হাওড়া, উভয় ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর জেলার উচ্চতা ৩০ মিটারের মধ্যে।

অধ্যাপক সিং এই অঞ্চলটিকে কয়েকটি উপভাগে ভাগ করেছেন

১। উত্তরের সমতলভূমি	ইহার দুটি ভাগ (ক) ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চল (খ) বরেন্দ্রভূমি
২। প্রকৃত বদ্বীপীয় অঞ্চল	ইহার ভাগগুলি হল (ক) মৃতকল্প বদ্বীপ অঞ্চল মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া (খ) সুন্দরবনের সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চল (গ) পরিণত বদ্বীপ অঞ্চল বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশ এবং সমগ্র হাওড়া ও হুগলী জেলা (ঘ) রাঢ় সমতলভূমি বলে কথিত বদ্বীপীয় অঞ্চলের প্রান্ত (ঙ) কাঁথি সমুদ্রোপকূল

সংক্ষেপে পশ্চিমবাংলাকে নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলিতে ভাগ করা হয়

১। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল
২। পশ্চিমের পুরুলিয়া জেলাসমেত মালভূমি অঞ্চল
৩। হিমালয় পাদলগ্ন তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল
৪। সমতলভূমি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত

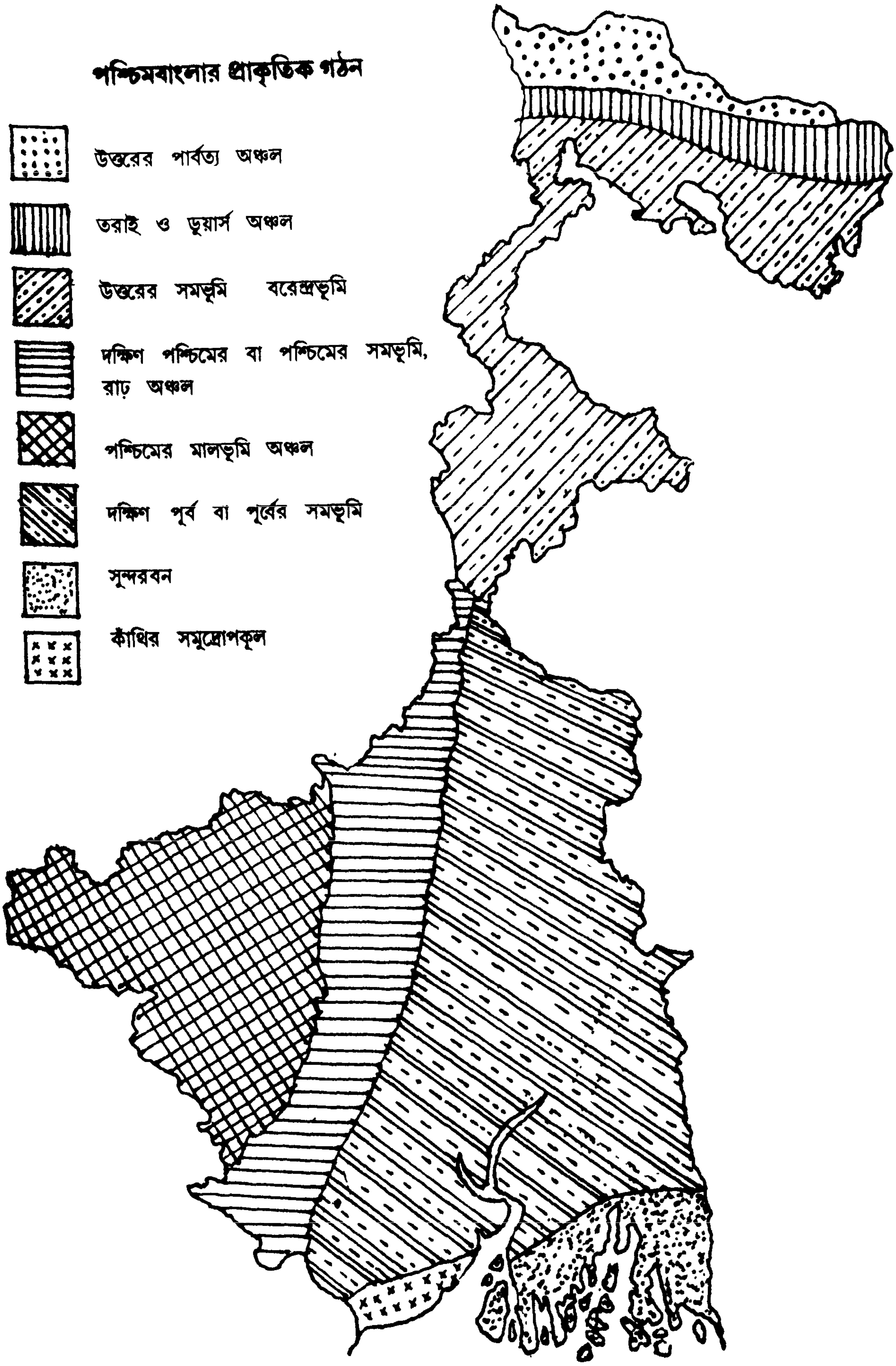
পশ্চিমবাংলার প্রাকৃতিক গঠন
উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল
তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল
উত্তরের সমভূমি বরেন্দ্রভূমি
দক্ষিণ পশ্চিমের বা পশ্চিমের সমভূমি, রাঢ় অঞ্চল
পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল
দক্ষিণ পূর্ব বা পূর্বের সমভূমি
সুন্দরবন
কাঁথির সমুদ্রোপকূল

(ক) উত্তরের সমভূমি বরেন্দ্রভূমি
(খ) দক্ষিণ পশ্চিম বা পশ্চিমের সমভূমি
(গ) দক্ষিণ পূর্ব বা পূর্বের সমভূমি
(ঘ) সুন্দরবন
(ঙ) কাঁথির সমুদ্রোপকূল

১। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল

রাজ্যের উত্তরে দার্জিলিং জেলার চারটি মহকুমার মধ্যে শিলিগুড়ি ছাড়া কার্শিয়াং, দার্জিলিং ও কালিম্পং মহকুমা নিয়ে এই অঞ্চল। ইহা বিস্তৃতিতে ছোট হলেও পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয়ের একটি অংশ। নেপালিরা হিমালয়ের তুষারাবৃত অংশগুলোকে 'হিমল' বলে। গঠনগতভাবে তিনটি ভাগের মধ্যে মধ্য ও বহিঃ হিমালয়ে ইহার অবস্থান। অঞ্চলগতভাবে বিভক্ত কয়েকটি ভাগের মধ্যে পূর্ব হিমালয়ে একটি অংশ দার্জিলিং-সিকিম হিমালয়ের সিঙ্গালিলা, দার্জিলিং ও কালিম্পং পর্বত শ্রেণী ও উপত্যকাগুলি নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। অঞ্চলটি অসম পাহাড়ী ভূমির সমবায়, খাড়া ঢাল, তীক্ষ্ণ পর্বতপৃষ্ঠ ও গভীর গিরিখাদ এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

উত্তরে রম্মম, বড় রংগিত ও তিস্তা নদীর একটি অংশ সিকিম থেকে, পশ্চিমে সিঙ্গালিলা পর্বতশ্রেণী নেপাল থেকে পূর্বে জলঢাকা নদী ভূটান থেকে এই অঞ্চলকে পৃথক করেছে। এই অঞ্চলটির দক্ষিণে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা ও জলপাইগুড়ি জেলা।

উত্তর দক্ষিণে প্রবাহমান তিস্তা নদীর গভীর গিরিখাত এই অঞ্চলটিকে দুভাগ করেছে। পশ্চিম দিকে দার্জিলিং ও কার্শিয়াং মহকুমা নিয়ে দার্জিলিং হিমালয়, পূর্বদিকে কালিম্পং মহকুমা নিয়ে কালিম্পং হিমালয়।

দার্জিলিং হিমালয় প্রধানতঃ উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত দুটি পর্বতমালা নিয়ে গঠিত। একটি সিঙ্গালিলা পর্বতমালা যাহা নেপাল থেকে দার্জিলিংকে পৃথক করেছে। ইহা সীমানাবস্তি থেকে ৩০০০ মিটারেরও বেশী উঁচু টংলুতে খাড়াভাবে উঠে গেছে। এখান থেকে ইহা সিঙ্গালিলা পর্বতমালা নামে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়েছে। এই পর্বতমালার গিরিশৃঙ্গ গুলি হচ্ছে টংলু (৩০২২ মি), সান্দাখফু (৩৫৭৯ মি), সবরগ্রাম (৩৫৪৩ মি), ফালুট (৩৬৬৬ মি)। এই পর্বতমালা নেপাল ও সিকিমের মধ্য দিয়ে আরও এগিয়ে তুষারমৌলি শৃঙ্গমালায় পরিণত হয়েছে। সিকিম, নেপাল ও তিব্বতের ত্রিসীমানার মিলন কেন্দ্রে অবস্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘা এই শৃঙ্গগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ হিমালয়ের এটি তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ। পৃথিবীর মধ্যেও তাই, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৮৫৮৬ মি। অন্যটি হচ্ছে সিঙ্গালিলা পর্বতমালার দক্ষিণপূর্বে দার্জিলিং পর্বতমালা। ইহা চারটি বড় পর্বতশ্রেণী নিয়ে গঠিত। সেঞ্চলের (২৪৪৮ মি) দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ঘুম (২২৪৬ মি) কে কেন্দ্র করে চারিদিকে বিস্তৃত। প্রথমটি হচ্ছে ঘুম শৈলশ্রেণী, যা পশ্চিম দিকে সীমানাবস্তির

নিকট সিঙ্গালিলা পর্বতমালায় মিলিত হয়েছে; এই পর্বতমালার গড় উচ্চতা ২১০০-২৪০০ মি; দ্বিতীয়টি সেঞ্চল মহালডিরাম শৈলশ্রেণী যা দক্ষিণে কার্শিয়াং এর উপর ডাউহিলের মধ্য দিয়ে শিলিগুড়ি সমভূমিতে নেমে গেছে; এই শৈলশ্রেণীর প্রথম উত্তর অর্ধেকের গড় উচ্চতা ২৪০০-২৬০০ মি। দক্ষিণ অর্ধেকের গড় উচ্চতা ২১০০ মি। উচ্চশৃঙ্গগুলি হচ্ছে পূর্বসেঞ্চল (২৬২৫ মি), টাইগার হিল (২৬০০ মি), পশ্চিমসেঞ্চল (২৪৯০ মি); তৃতীয় শ্রেণীটি হচ্ছে তাকদা পর্বতশ্রেণী, যা টাইগারহিলের নীচে সেঞ্চল পর্বতশ্রেণী থেকে বের হয়ে দক্ষিণ পূর্বে বিস্তৃত হয়ে বড় রংগিত ও তিস্তা নদীর সঙ্গম স্থলে মিলিত হয়েছে। ইহার গড় উচ্চতা ২২২৫-২১০০ মি; চতুর্থটি হচ্ছে দার্জিলিং জলা পাহাড় পর্বতশ্রেণী, যা ঘুম থেকে উত্তর দিকে বিস্তৃত হয়ে প্রথমে হঠাৎ ২৪০০মি পর্যন্ত ওঠে এবং এর পর ক্রমশ নীচু হয়ে দার্জিলিং এর চৌরাস্তায় নেমে আসে এবং আবার অবসারভেটরি হিলে (২১৮৬ মি) উঠে যায়। এই স্থানে পর্বতশ্রেণীটি দুটি পার্শ্বশাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি লেবং অন্যটি তাকভর পার্শ্বশাখা, এই দুটি পার্শ্বশাখা বড় রংগিতের একটি উপনদী রংগিতের সরু উপত্যকা সৃষ্টি করেছে।

দার্জিলিং শহর (২০৪৪ মি) টাইগারহিলের উত্তরশাখার উপর অবস্থিত।

এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান নদীগুলি হচ্ছে তিস্তা, বড় রংগিত, রম্মম, ছোট রংগিত, রংগনু, মহানন্দা, বালাসান, মেচি।

এই অঞ্চলের অন্যান্য বিশেষ শহর ও দর্শনীয় স্থানগুলি হচ্ছে দার্জিলিং শহর, ঘুম, জোড়বাংলো, জলাপাহাড়, সোনাদা, সুখিয়াপোখরী, মনিভঞ্জন, বার্চহিল, লেবং, কার্শিয়াং এর ডাউহিল, তিনধরিয়া ইত্যাদি।

দার্জিলিং থেকে ২৯ কিলোমিটার দূরে সিনকোনা, ইপিকাক এবং অন্যান্য ভেষজ উদ্ভিদের চাষের কেন্দ্র মংপু।

তিস্তার পূর্বদিকে কালিম্পং মহকুমা ও অরণ্য বিভাগকে নিয়ে কালিম্পং হিমালয়। এই অঞ্চলটির উত্তরে সিকিম ও ভুটান, পূর্বে জলঢাকা নদী, দক্ষিণে জলপাইগুড়ি জেলা, পশ্চিমে তিস্তা নদী; অঞ্চলটি পর্বতময়। নদীগুলির উপত্যকা কেবল সমতল। ভূটানের ডনকাইয়া পর্বতমালা দক্ষিণমুখী একটি সমুচ্চ পর্বতশ্রেণী জিপমোচির (৩৫২৫.৫ মি) নিকট দুটি বিরাট শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি দক্ষিণ পূর্বে, অন্যটি দক্ষিণ পশ্চিমে বিস্তৃত হয়েছে। এই দুটি পর্বতশ্রেণীর মাঝেই জলঢাকা নদী উপত্যকা। দক্ষিণ পশ্চিমমুখী এই পার্শ্ব শাখা ও ইহার অসংখ্য প্রশাখা নিয়েই তিস্তার পূর্ব দিকে কালিম্পং পর্বতমালা। সমুদ্রতল থেকে এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা (৯২-৩০৫ মি), সিকিম, ভূটান ও কালিম্পং মহকুমার ত্রিসীমানায় অবস্থিত এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ রিসিলা বা রেচিলা (৩২০৩মি), ডুয়ার্সের দিকে অন্যান্য শৃঙ্গগুলি খেমপুং (২৩৭৯ মি), সংচংলু (২০৫৪ মি), গরুবাথান (৩০০০ মি), তিস্তার দিকে ড্যামশং (১৯২১.৫ মি), পদমুল (২১০৪.৫ মি), নেওরা উপত্যকা কালিম্পং শহরের পূর্বে অবস্থিত, কালিম্পং এর কাছে লাভা থেকে ১০ কিলোমিটার

উত্তর পূর্বে অগ্রসর হলে রেচিলা ও পাংকাসারি পাহাড়, এখানেই নেওরা নদী। নদীটি রেচিলা শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং প্রায় ৬০ কিলোমিটার লম্বা, এই নদীর উপত্যকাই হচ্ছে নেওরা উপত্যকা।

চেল, নেওরা, পাংকাসারি, জলঢাকা, তিস্তা অরণ্য অঞ্চল এই অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। এই অঞ্চলের নদীগুলি উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। সবচেয়ে দীর্ঘ নদী তিস্তা, ইহার অসংখ্য উপনদীর মধ্যে প্রধান রিলি নদী রিয়াং এর উল্টোদিকে তিস্তায় এসে পড়েছে। অন্যান্য নদীগুলি হচ্ছে লিস, গিস, রামথি, চেল এবং মুর্তি। তিব্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে জলঢাকা নদী ইহার পূর্বসীমা বরাবর প্রবাহিত হচ্ছে।

এই অঞ্চলের অন্যান্য শহর, নগর ও দর্শনীয় স্থানগুলি হচ্ছে ডালিং, কালিম্পং শহর (১২০০ মি), কালিম্পং শহরের ২৪ কিলোমিটার দূরে পেডং (১৪৫২ মি), কালিম্পং এর উত্তরপূর্বে রিকিসাম বা রিসিসুম বা রিসুম।

২। পশ্চিমের বা দক্ষিণপশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল

বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমি পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়ে পশ্চিমবাংলার পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল সৃষ্টি করেছে। বীরভূমের উত্তরে রাজমহল পাহাড়ের কাছ থেকে বর্ধমান ও বাঁকুড়ার মধ্য দিয়ে মেদিনীপুর জেলা পর্যন্ত প্রায় ১৬ কিলোমিটার প্রশস্ত এই মালভূমি অঞ্চল। বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ ও ত্রিকোণাকৃতি সমগ্র পুরুলিয়া জেলা নিয়ে এই অঞ্চল। ছোটখাট পাহাড়, টিবি, ফাটল, গহ্বর ঢেউ খেলানো প্রান্তর ছাড়া কয়েকটি উঁচু পাহাড় এখানে রয়েছে। এখানকার গড় উচ্চতা ৫০-৪৫০ মিটার। এই অঞ্চলটির সবচেয়ে উঁচু অংশটি রয়েছে পুরুলিয়া জেলায়, সর্বনিম্নটি মেদিনীপুর জেলায়। সর্বনিম্ন অংশটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫০ মিটার উঁচু। পুরুলিয়া জেলার অনেক জায়গায় ২০০-৩০০ মিটার উঁচু কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পাহাড় রয়েছে। এই জেলার পশ্চিমে পর্যায়ক্রমে পাহাড় ও উপত্যকা রয়েছে। যেমন ঝালদা অঞ্চলে উঁচু পাহাড় রয়েছে। আরও দক্ষিণে বাঘমুণ্ডি ও অযোধ্যা পাহাড় বর্তমান। অযোধ্যা পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি হচ্ছে গোরগাবুরু বা গজবুরু, উচ্চতা ৬৭৭ মিটার, ইহা মালভূমি অঞ্চলের সর্বোচ্চ স্থান। এ ছাড়া বিহারের সিংভূম সীমান্তে অবস্থিত দলমা পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গের উচ্চতা ১০৩৮ মিটার, অযোধ্যা পাহাড়ের সীমানা পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদী এবং উত্তর দিকে দামোদরের উপনদী গোয়াই পর্যন্ত। এই উপনদীটি পাঞ্চেত নামক হ্রদে গিয়ে মিশেছে। হ্রদটি ১৫ কিলোমিটার লম্বা। দামোদরের বাঁধ ইহার পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। হ্রদটির দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত পাঞ্চেত পাহাড়ের উচ্চতা ৬৪৩ মিটার, পাহাড়টির উপরিভাগ সমতল। পাঞ্চেত ও অযোধ্যা পাহাড়ের পশ্চিমে রয়েছে বিহারের হাজারিবাগ মালভূমির বিচ্ছিন্ন অংশ।

পুরুলিয়ার উচ্চভূমির বাকী অংশ ১০০-৩০০ মিটার উঁচু এবং ক্রমশঃ দক্ষিণ পূর্বদিকে ঢালু হয়ে গেছে। জেলার নদীগুলি পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রবাহিত। দামোদর

উত্তরপ্রান্তে প্রবাহিত। কংসাবতী ঝালদার উত্তরের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত, আর সুবর্ণরেখা বাঘমুণ্ডির পশ্চিম ও দলমা পাহাড়ের দক্ষিণদিক দিয়ে প্রবাহিত। অযোধ্যা পাহাড়ের পূর্ব প্রান্তের নিকট থেকে উদ্ভূত হয়েছে শিলাই ও দ্বারকেশ্বর নদী।

ত্রিকোনাকৃতি পুরুলিয়ার দক্ষিণকোন বরাভূম নামে পরিচিত। ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাহাড়ীভূমি দক্ষিণ পূর্বদিকে মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমে বিস্তৃত। উচ্চতা ক্রমশঃ কমে ১০০ মিটারের নীচে নেমে গেছে। সর্বনিম্ন উচ্চতা ৫০ মিটার। এখানে মালভূমি মাকড়া পাথরে গঠিত। মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও পশ্চিমাংশ মালভূমির মধ্যে পড়ে। এখানকার মাটি হচ্ছে ল্যাটারাইট।

পুরুলিয়ার উচ্চভূমি বাঁকুড়া জেলায় বিস্তৃত হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার মধ্য ও উত্তর পশ্চিমের যথাক্রমে উচ্চভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে মালভূমি অঞ্চল। এই জেলার শালতোড়া থানার বিহারীনাথ (৪৪৮ মিটার) এবং ছাতনা থানার শুশুনিয়া (৪০০ মিটার) পাহাড়। উল্লেখযোগ্য পাহাড় বলতে আর কিছু নেই। নীচু পাথরের উচ্চভূমির উত্তর দিক দিয়ে দামোদর নদী প্রবাহিত এবং শালি ইহার উপনদী। শালিনদীর উপত্যকা ঢেউ খেলানো ভূখণ্ডে গঠিত। গঙ্গাজলঘাটির উত্তরে দামোদরের নিকটবর্তী এলাকার ভূমি ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে তৈরী। চারিদিকে দেখা যায় ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন পাহাড়। মেঝিয়ার দক্ষিণে দুর্লভপুরের সংলগ্ন এলাকা পাথরে সমাকীর্ণ, পাথরগুলি কেলাসিত। অল্প ঢেউ খেলানো মাকড়া পাথুরে মাটি সোনামুখী ছাড়িয়ে পূর্বে বিস্তৃত হয়েছে, এর কয়েক কিলোমিটার দূরে ১০০ মিটার উঁচু কারাসোলি নামে সর্বশেষ পাথুরে টিবি অবস্থিত।

দামোদর বাঁকুড়ার উত্তরসীমান্ত এবং দ্বারকেশ্বর নদী বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে, শিলাই ও কাসাই জেলার দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত, দামোদর নদী পশ্চিম বাংলার সীমারেখা বরাবর অগ্রসর হয়ে দামোদরের বড় উপনদী বরাকরের সঙ্গমস্থল পর্যন্ত গিয়েছে। তারপর এই সীমারেখা বরাকর বরাবর অগ্রসর হয়ে মাইথনের কৃত্রিম হ্রদ পর্যন্ত চলে গেছে এবং ইহা পূর্বদিকে চিত্তরঞ্জন রেল কারখানার ওপারে অজয় নদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, আরও কিছুদূর যাওয়ার পর পশ্চিমবাংলা সীমান্ত বীরভূম জেলায় প্রবেশ করেছে। মালভূমির এই অংশের প্রাকৃতিক গঠন বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা থেকে আলাদা। শেষের জেলা দুটির পাথর কেলাসিত নয়। এই অঞ্চলের নোনিয়া নামে একটি ছোট নদী আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, অজয়ের দক্ষিণে এর উপনদী কুনুর নদীর উপত্যকা। এখানকার কয়েক কিলোমিটার দূরে ভালকী নামে মাত্র ৭০ মিটার উঁচু টিবি মালভূমির সর্বশেষ চিহ্ন।

বর্ধমান জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ বিশেষ করে আসানসোল মহকুমা মালভূমির অন্তর্গত, এখানেই রয়েছে রানীগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্র, মালভূমির প্রান্তের কেন্দ্রাংশ হচ্ছে বর্ধমান।

মালভূমির উত্তর অংশ বীরভূম জেলার অন্তর্গত। এখানকার মধ্যস্থলে কোপাই নদীর পাশে রয়েছে শান্তিনিকেতন। ময়ূরাক্ষী ও ইহার উপনদীগুলি এই অঞ্চলের পূর্ব

পশ্চিমে বিস্তৃত। জেলার উত্তরপশ্চিম থেকে দক্ষিণপূর্ব পর্যন্ত মালভূমির অংশ। মোরে ও অজয় প্রধান নদী। অজয়ের উত্তরের মালভূমির প্রত্যন্ত ভাগ খুব সংকীর্ণ। এখানে কেলাসিত শিলার অস্তিত্ব বর্তমান। এরপর মালভূমির প্রান্ত ক্রমশ গঙ্গার নিকটবর্ত্তী হয়েছে, মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরতম প্রান্তে ফরাক্কার নিকট গঙ্গার দক্ষিণ তীরে পাহাড় রয়েছে, ময়ূরাক্ষী নদী এবং উত্তর দিকে কোপাই ও বক্রেশ্বর এবং দক্ষিণ দিকে দ্বারকা ও ব্রাহ্মনী উপনদীগুলি মালভূমির থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

৩। হিমালয় পাদলগ্ন তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল

দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং ও শিলিগুড়ি মহকুমার কিয়দংশ নিয়ে তরাই অঞ্চল। তরাই এর বেশীরভাগ উত্তরপ্রদেশে, অল্প অংশই পশ্চিমবাংলায় রয়েছে। দার্জিলিং জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ বা জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ নিয়ে ডুয়ার্স অঞ্চল। তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলটি দার্জিলিং হিমালয়ের পাদদেশ নিয়ে গঠিত। হিমালয়ের পাদদেশ ক্রমশ ঢালু হয়ে ধীরে ধীরে সমতল হয়ে গেছে। হিমালয় নিঃসৃত খরস্রোতা নদীগুলির খরস্রোতের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ক্ষয়ীভূত পাথরের চাঙ্গড়, নুড়ি, বালি, পলি ও কাদামাটি নেমে আসে, সমভূমিতে নামার পর নদীস্রোত আর এগুলোকে বয়ে নিয়ে যেতে পারে না, সেখানেই সেগুলি জমে থাকে। পাহাড়ী নদীগুলির পার্শ্বে সৃষ্টি হয়েছে গহন অরণ্য। এইসব খরস্রোতা নদীগুলির পরিসর প্রশস্ত। নদীগুলি হচ্ছে লিস, গিস, জলঢাকা, তোরসা, সংকোষ, রায়ডাক, মহানদী, বালসান, মেচি, লিস ও গিসের মত ছোট নদীর স্রোত এক থেকে দুই কিলোমিটার চওড়া, সবচেয়ে বড় নদী হচ্ছে তিস্তা। এই সব পার্বত্য নদীগুলি খরস্রোতা, এই নদীগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে নদীগুলি পলি দিয়ে গড়া উঁচু তীরভূমি থাকে। এই পলি সাধারণতঃ পুরনো পলি, কখনও কখনও এই তীরভূমি দশ থেকে পনের মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়।

এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রবল, বাঘ, হাতীসহ অসংখ্য ধরনের বন্য প্রাণী অধ্যুসিত গহন বনে আচ্ছন্ন এই অঞ্চল, এই অঞ্চলে নদী বাহিত সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে কাঁকর জমা হয়, স্রোতস্বিনী নদীগুলি এই কাঁকরের আবরণ ভেদ করে প্রবাহিত হয়। এই অঞ্চলের উচ্চতা প্রায় ১৫০ মিটারের কিছু উপরে।

৪। সমতলভূমি

ইহা প্রকৃত বদ্বীপীয় সমভূমি। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, অসংখ্য নদী ও ইহাদের শাখা ও উপনদী বাহিত পলিমাটি নিয়ে এই সমতল ভূমি। তরাই, ডুয়ার্স ও পুরুলিয়া জেলা বাদে প্রায় সমগ্র পশ্চিমবাংলা নিম্ন গাঙ্গেয় সমতলভূমির অন্তর্গত। ইহা উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলার শেষাংশ থেকে দক্ষিণে সুন্দরবন ও কাঁথি উপকূল রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা মূলতঃ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। *(ক) উত্তরের সমভূমি ও বরেন্দ্রভূমি (খ) দক্ষিণ পশ্চিম বা পশ্চিমের সমভূমি (গ) দক্ষিণ পূর্ব বা পূর্বের সমভূমি (ঘ) সুন্দরবন (ঙ) কাঁথির সমুদ্রোপকূল।*